ইউনিট ৭

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মাজারের লালসালু সম্পর্কিত আরও কাহিনীর বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- আক্কাসের একটি স্কুল করার প্রচেষ্টা ও তা ভন্ডুল হওয়ার কাহিনী লিখতে পারবেন।
- গ্রামে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে ওঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ঐখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এ কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারে গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তা আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরানো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনখানে যদি রঙ চটে যায়, বা সালু কাপড়ের কোন স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া–তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারি হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহীমা বিড়বিড় করে বলে, –তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারি। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিলো বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিলো। ভেবেছিলো, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এ জন্য আরো বেশি বোধ করলো যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিলো না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোন কারণ দেখলো না। ভাবলো, বিদেশী হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা'দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কী দু-দুটো মক্তব বসানো হয়নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগলো চরকির মত। ইস্কুলের জন্য দস্তরমত চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগলো, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কথা এ যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কোনপ্রকার ভনিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করলো,

—কী হুনি ব্যাপারী মিঞা?

ব্যাপারী বলে, কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এলো।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলো। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে —এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এলো। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রগ। ঠাস্ করে চড় মারা ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,

—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলো, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। ইস্কুল হবে কী হবে না —সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাটা, কারো স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারো-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মত একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেতো। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে—দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছিলো এ ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

—আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ—তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস ম্লান বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এ বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুফির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার—এ রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইলো তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে–।

সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকতো আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচতো; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, –মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইতো, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরতো—আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিলো, কিন্তু মজিদের এক'শ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, –ভাইসকল! পোলা মাইন্ষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে—তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরী ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে—এ আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নোতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেলো। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বলে,

—বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন!

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন—আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

—তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে ওঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

—চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মত কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এ ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে ওঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মত খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারো না কারো যেন যৎকিঞ্চিত হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এ ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশখোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটলো। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমীয়ের কোন অন্যায়ের বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

—ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে—এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক—একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে ওঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাদদেশে – নিচে। **রোশনাই** – আলোকিত। **নজরে** – দৃষ্টিতে। **পাত** – লোহা বা তামার পাতলা করা অংশ। **বিবর্ণ** – রং ওঠা। **সৌখিনতা** – সখ। **চাকচিক্য** – উজ্জ্বলতা। **অন্তর** – পর। **গাত্রাবরণ** – গিলাফ। **আফসোস** – অনুতাপ। **বরঞ্চ** – বরং। **প্রার্থী** – ইচ্ছুক ব্যক্তি। **উপযুক্ততা** – যোগ্যতা। **গর্হিত** – খারাপ। **ভারি** – দুঃখিত। **আড়ত** – ব্যবসা-কেন্দ্র, কেনা-বেচার জায়গা। **লাট-বেলাট** – ক্ষমতাশালী। **প্রত্যাবর্তন** – ফিরে আসা। **রকম-সকম** – ভাবভঙ্গি। **উ[illegible]ক্কা** – অবাধ্য। **মুরুব্বি** – গুরুজন। **ওক্ত** – নামাজের সময়। **পরিত্রাণ** – উদ্ধার। **মক্তব** – মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। **বৈঠক** – সভা। **অপ্রত্যাশিত** – যা আশা করা হয়নি, অভাবনীয়। **বৃষ্টি পানি সিঞ্চিত** – বৃষ্টির পানিতে ভেজা। **ছাটা** – কেটে ছোট করা। **ক্ষীণ** – অল্প, মৃদু। **বেআদবি** – অভদ্রতা। **রুদ্ধ** – বন্ধ। **বেয়াড়া** – অবাধ্য। **সূত্র** – সম্পর্ক। **বদ মতলব** – দুষ্ট বুদ্ধি। **দিনকাল** – সময়। **এধার-ওধার** – এদিক ওদিক। **বেকুফি** – বোকামি। **মতিগতি** – মনের ভাব। **চাষাভুষা** – চাষী জাতীয় সাধারণ

লোক। **শিলাবৃষ্টি** – ঝড়ো বৃষ্টির সঙ্গে বরফ খণ্ড পড়া। **শিরালি** – শিলাবৃষ্টির ভয় কাটানোর জন্য যারা মন্ত্র পড়ে। **যপতপ** – মন্পাঠ। **নগ্ন** – নেংটা। **শিরনি** – পুণ্য লাভের জন্য মসজিদে বা পীরের বাড়িতে দেয়া পায়েস জাতীয় খাদ্য। **খতম পড়ানো** – মৃতের সৎকার, বালাই বা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোল্লা মৌলবীদের দিয়ে কোরান পাঠ। **সমস্বরে** – এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে। **দররা** – চাবুকের আঘাত। **ঘরে ঢোকা** – অবাধ যৌনমিলন। **নিত্যকার** – প্রতি দিনের। **বদ খেয়াল** – দুষ্ট ইচ্ছা। **হেদয়ায়ত** – সংশোধন। **মর্জি** – ইচ্ছা। **শাস্তিবিধান** – শাস্তির ব্যবস্থা। **চমৎকৃত** – অবাক। **উচ্ছ্বসিত** – বেশি আবেগপূর্ণ। **গদগদ** – অতিরিক্ত খুশি। **মুসল্লি** – যারা নামাজ পড়ে, নামাজী। **বাঞ্ছনীয়** – যে রকম ইচ্ছা করা হয়েছে, কাম্য। **বেত্তমিজ** – অভদ্র। **আকৃতি** – আকার। **গুরুতর** – বেশি গুরুত্বপূর্ণ। **খামখেয়ালী** – খেয়াল খুশি মতো যে চলে। **বড়গা** – বরগা, ছাদের ভার, রক্ষার জন্য ব্যবহৃত কাঠ অথবা লোহা। **হুড়কা** – দরজার খিল। **যৎকিঞ্চিত** – সামান্য। **গতর** – শরীর। **নির্মাণ** – তৈরি। **সকাতর** – কাতরতাসহ। **আর্জি** – নিবেদন, প্রার্থনা। **খায়েশ-খোয়াব** – ইচ্ছা ও স্বপ্ন। **পাট** – কাজকর্ম। **দিল** – হৃদয়, মন। **কানাঘুষা** – কানে কানে কথা চালাচালি। **বাজা** – বন্ধ্যা, যে নারীর সন্তান হয় না। **হিড়িক** – হুজুগ। **কষ্টি পাথর** – সোনা ইত্যাদি যাচাই করার বিশেষ পাথর। **পরমাত্মীয়** – অতি নিকটজন। **মঞ্জুর** – গৃহীত। **আস্ত** – পুরো। **ক্ষান্ত** – শেষ। **জোশ** – উত্তেজনা। **ফের** – আবার। **দরিয়া** – নদী।

বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ

উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাড়ের মধ্যে – সব উজ্জ্বলতার মধ্যে।

মন অন্ধকার হওয়া – মনে দুঃখ আসা।

অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে – অনেকেই কিনতে চায়।

কয়েকজন রুপালি চাকচিক্য – উচ্চ গিলাফে ঢাকা মাজার

বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে – বুকের ভিতরে দুঃখ জাগে।

কালো করে রেখেছে কেমন – মনটা বিষাদে ভরে গেছে।

হাওয়ায় কদিন ধরে একটা কথা ভাসে – প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ইস্কুল বসানো – বিদ্যালয় তৈরি করা।

কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব – কাউকে তোয়াক্কা করছে না এমন ভাব।

তসবি টিপতে পারবে – ধর্মকর্ম করতে পারবে।

মাথাটা একটু গরম ধরেছে – মাথা বিগড়ে গেছে।

অন্যের মাথা গরম করা – অন্যকে রাগিয়ে দেয়া।

ওঠে পড়ে লেগে গেলো – তৎপর হল।

যুক্তি তর্কের ধার ধারে না – যুক্তি মানে না।

যে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো – চারদিকে অনবরত যেতে লাগল।

বাড়াবাড়ির সীমা – অতিরিক্ত কিছু করার সীমা।

আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা – নিজের ভাবনায় ডুবে থাকার কারণে উদাসীন ভাব।

মুখ খুলেছে – কথা বলতে শুরু করেছে।

খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রগ – রেগে বা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

গা ঢিলা করে – স্বস্তি পায়।

কথাটা ঢাকা পড়ে গেছে – কথাটি নিয়ে আর কেউ আলোচনা করছে না।

গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে – শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

জীবন আর কদিন – জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

দুনিয়ার পাট গুটানো – পৃথিবীর কাজ কর্ম শেষ করে আনা।

ডাল পালা শাখা প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে – কথাটা সব দিকে ছড়াচ্ছে।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

আমাগো মনের কথাডাই কইছেন – আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন।

কথাডা ঠিকই – কথাটা ঠিকই।

আমি কত কই ছ্যামড়া দাড়ি রাখ তা হের কান দিয়া যায় না কথাটা – আমি কত বলি, ছেলে দাড়ি রাখ তা ওর কান দিয়ে যায় না কথাটা।

আপনি যা হুনছেন – আপনি যা শুনেছেন।

আইজকাইল ইংরাজি না পড়েল চলব ক্যামনে – আজ কাল ইংরেজি না পড়েল চলবে কীভাবে।

পোলা মাইনষের – ছেলে মানুষের।

গিরাম – গ্রাম।

আমাগো ভালে ধান হইছে – আমাদের ভালো ধান হয়েছে।

ফেলাইয়া রাখা ঠিক না – ফেলে রাখা ঠিক নয়।

চুপ কর ছ্যামড়া – চুপ কর ছেলে।

বেত্তমিজের মত কথা কইস না – অভদ্রের মতো কথা বলিস না।

পাঠসংক্ষেপ

এক রাতে মোমবাতি আলোয় মজিদ দেখে মাজারের ঝালরের এক পাশের কিছু অংশের রং নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য দুবছর তিন বছর অন্তর মাজারের গিলাফ পরিবর্তন করা হয়। তবু মাজারের কিছু হলে মজিদের খারাপ লাগে। রহীমা কিন্তু আমেনা বিবির কথা ভুলতে পারে না। খোদা দয়ালু হয়েও এত কঠিন কেন? রহীমার কথায় মজিদ চমকে ওঠে।

এদিকে মোদাব্বের মিঞার ইংরেজি পড়া ছেলে আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলতে লাগল এবং সরকারের কাছে আবেদনপত্রও দিল। গ্রামের মুরুব্বিরা এটি পছন্দ করেনি, মজিদ তো নয়ই। মজিদ আক্কাসকে কাবু করার পথ খুঁজতে লাগল। স্কুলের ব্যাপারে যে বৈঠক বসল তাতে মজিদ হঠাৎ আক্কাসকে জিজ্ঞেস করে বসল তার দাড়ি কই। আক্কাস স্কুল সম্পর্কে কথা বলতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু এ রকম উদ্ভট আক্রমণে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মজিদের প্রভাবে মহব্বতনগরের সবাই দাড়ি রাখতে শুরু করেছে, শুধু ব্যতিক্রম আক্কাস। মজিদ সকলকে বুঝিয়ে দিল যে, স্কুল গড়ার চিন্তা আক্কাসের মনের একটি বদ খেয়াল মাত্র। এরপর মজিদ একটি নতুন প্রস্তাব দেয়। তাহল মহব্বত নগর গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হলেও এখানে পাকা মসজিদ নেই। পাকা মসজিদ করার প্রস্তাবে সবাই প্রবল উৎসাহ বোধ করে। খালেক ব্যাপারী খরচের বারো আনা বহন করার আগ্রহ দেখায়। তবে মসজিদ নির্মাণে গ্রামের সকলেরই কিছু না কিছু অংশ থাকতেই হবে। এটি মজিদের ইচ্ছা। এভাবে আব্বাসের স্কুল গড়ার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। মোদাব্বের মিঞাই জানায় ছেলে যদি আর অগ্রসর হয় তাকে দু টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে-সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে কেন?
২. মজিদ কীভাবে লাভবান হয়?
৩. রহীমা মজিদের সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেন?
৪. আব্বাস কে? সে কি করতে চায়? কেন করতে চায়?
৫. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা? - এটি কার উক্তি? এ কথা বলার কোন কারণ আছে?
৬. 'মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি!' এখানে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দিন।
৭. আক্কাস কেন বৈঠক থেকে ওঠে চলে যায়?
৮. মসজিদ তৈরির খরচের ব্যাপারে মজিদের কী প্রস্তাব থাকে?
৯. খালেক ব্যাপারী কেন বারো আনা খরচ বহন করতে চায়।
১০. আপনি এ পাঠের বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলো অর্থসহ সাজিয়ে লিখুন।
১১. এ পাঠের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যগুলোর অর্থ লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে কেন?

উত্তর : এক রাতে মোমবাতির উজ্জ্বল আলোয় মজিদ দেখে মাজারের গিলাপের ঝালরের একটি অংশ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঐ জায়গাতে সুতোও একটু খসে গেছে। এ কারণে মজিদের মনে দুঃখ জাগে। মজিদ মাজারের রক্ষক ও পীর। তার মান মর্যাদা মাজারকে ঘিরে। মাজারের প্রতি তার টানও রয়েছে বেজায়। মাজারের সামান্য ক্ষতি হলেও তার মন খারাপ হবে। সে সবসময় চায় মাজারের সবকিছু ঝকঝকে থাকুক।

প্রশ্ন : মজিদ কীভাবে লাভবান হয়?

উত্তর : মাজারের গিলাফ বদলানো হয় দু-বছর তিন বছর পর পর। পুরোনো গিলাফ কেনার জন্য গ্রামের অনেক লোক খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সব প্রার্থীর মধ্যে সেই উপযুক্ত যে বেশি টাকা দিতে পারে। এ গিলাফ বেচার টাকা পায় মজিদ নিজেই। সুতরাং যত বেশি টাকায় সে গিলাফ বিক্রি করতে পারে ততই তার লাভ।

প্রশ্ন : রহীমা মজিদের সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেন?

উত্তর : আমেনা বিবির জন্য রহীমার মনটা সারাদিন খারাপ থাকে। তার মনে কেবল একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে। আমেনা বিবির এত বড় শাস্তি হল কেন? সে যে অন্যায় কিছু করেছে এমন তো দেখা যায়নি। আবার করেনি যে তাও বলা যায় কি করে। মজিদ যখন বলেছে তখন তা অবিশ্বাস করা যায় না। ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে যায় রহীমা। তবু আমেনা বিবির জন্য তার খারাপ লাগে। দয়ালু খোদা এত কঠিন কেন? আমেনার জন্য রহীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মজিদের সামনে।

প্রশ্ন : আক্কাস কে? সে কি করতে চায়? কেন করতে চায়?

উত্তর : আক্কাস মোদাব্বের মিঞার ছেলে। সে ইংরেজি স্কুলে পড়েছে। তারপর বিদেশে গিয়ে বহুদিন থেকেছে। সেখানে চাকরি করে পয়সা জমিয়ে সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে।

আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আক্কাসের এ ধারণা হয়েছে যে স্কুলে না পড়লে মুসলমানের ছেলের উন্নতি হবে না। গ্রামে মক্তব আছে বটে, কিন্তু মক্তব্যে পড়ে পড়ুয়ারা আধুনিক চেতনা থেকে পিছিয়ে থাকে। সে জন্য আক্কাস মনে করে গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত।

প্রশ্ন : 'তোমার দাড়ি কই মিঞা? - এটি কার উক্তি? এ কথা বলার কোন কারণ আছে?

উত্তর : উক্তিটি মজিদের।

মজিদ এ কথাটি বলেছে মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাসকে। আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আধুনিক শিক্ষা গ্রামে চালু হলে মক্তবের লেখাপড়ায় পড়ুয়াদের আগ্রহ কমে যাবে। তখন মজিদের মতো ধর্মের কারবারীদেরও অসুবিধা হবে। সে জন্য মজিদ গ্রামে স্কুল হতে দিতে চায় না। মজিদের সুবিধা হল এ যে, গ্রামের অজ্ঞ লোকেরা তাকে ভয় করে এবং তার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু আক্কাস তো সে রকম ছেলে নয়। আক্কাসকে থামিয়ে দিতে মজিদ তৎপর হয়। মুসলমানের ছেলে দাড়ি রাখে না এ কথাটি বললে গ্রামের লোকেরা আক্কাসের বিরুদ্ধে যাবে। বাস্তবে হয়েছে তাই। মজিদ লোকজনের সামনে এটি প্রমাণ করল যে আক্কাস ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মানে না।

প্রশ্ন : 'মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি!' এখানে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দিন।

উত্তর : এখানে চেতনা বলতে ইসলাম ধর্মের চেতনার কথা বলা হয়েছে। মজিদ যখন এ গ্রামে প্রথম এসেছিল তখন সে দেখেছিল এ গ্রামের মানুষেরা ধর্মকর্মের ধার ধারে না। সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এখন। এখন সাধারণ লোকও কলমা জানে। তাঁরা পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে এবং রোজার দিনে রোজা রাখে। অনেক কুসংস্কার ও সামাজিক প্রথা বন্ধ হয়েছে। শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা শিরালির মন্ত্রে বিশ্বাস করত। এখন তারা দোয়া দরুদ পড়ে, মসজিদে শিরনি দেয় এবং খতম পড়ায়। আগে মেয়েরা ধান ভানতে গান গাইত, এখন তা বন্ধ হয়েছে। এখন মজিদের একশ দোররার ভয়ে অবাধ যৌনাচার সম্পর্ণ বন্ধ হয়েছে। সুতরাং নতুন চেতনা তো হয়েছে।

প্রশ্ন : আক্কাস কেন বৈঠক থেকে ওঠে চলে যায়?

উত্তর : আক্কাস বৈঠকে এসেছিল স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলতে। কিন্তু মজিদ আচমকা এমন এক প্রশ্ন করে বসল যে আক্কাস একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বৈঠকে আক্কাস ছাড়া অন্য সকলের দাড়ি ছিল। দাড়ি থাকা না থাকার সঙ্গে স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ সে কথা বোঝে না। দাড়ি নাই কেন এ প্রশ্নটি করে মজিদ আক্কাসকে একেবারে চুপসে দিল। তারপর মজিদ গ্রামে একটি পাকা মসজিদ স্থাপনের প্রস্তাব দিলে উপস্থিত সবাই একবাক্যে সায় দিল। আক্কাস স্কুলের কথাটা আবার তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু পিতার ধমকে সে আর কিছু বলতে পারল না। সবাইকে মসজিদ করা নিয়ে আলোচনা করতে দেখে আক্কাস আসর থেকে ওঠে চলে গেল। সে বুঝল যে এ সভায় সে অবাঞ্ছিত।

প্রশ্ন : মসজিদ তৈরির খরচের ব্যাপারে মজিদের কী প্রস্তাব থাকে?

উত্তর : মসজিদ তৈরি করতে হলে খরচ হবে। সে খরচ কে বহন করবে? মজিদ প্রস্তাব দেয় মসজিদ তৈরিতে গ্রামের সকলের তৌফিক অনুযায়ী কম বেশি দান যেন থাকে। কিন্তু গ্রামে অনেক মানুষ আছে যাদের একটি পয়সাও নেই। সেক্ষেত্রে তারা শারীরিক পরিশ্রম করে মসজিদ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন : খালেক ব্যাপারী কেন বারো আনা খরচ বহন করতে চায়।

উত্তর : খালেক ব্যাপারী গ্রামের মাতব্বর এবং সবচাইতে পয়সাওয়ালা লোক। আগেও সে মাজারের জন্য অনেক পয়সা খরচ করেছে, গিলাফ বদলে দিয়েছে। এখন সে মসজিদের জন্যও টাকা দেবে। কিন্তু বেশির ভাগ খরচ সে একাই বহন করতে চায়। তার মনটা বড় অশান্তিতে আছে সংসারেও তার বিরাগ এসেছে। আগের মতো দুনিয়ার কাজে সে শান্তি পায় না। সে জন্য সে পরকালের চিন্তা করে এবং সওয়াব অর্জন করতে চায়। মসজিদের বারো আনা খরচ বহন করার আর্জির কারণ একটি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এ কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য।
২. রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে মন।
৩. শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই।
৫. দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়।

তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এ কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য।

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে মাজারের প্রতি মজিদের মমতার কথা বলা হয়েছে।

মজিদ বাইরে থেকে এসে মহব্বতনগর গ্রামে স্থায়ীভাবে আস্তানা তৈরি করেছে। ধর্মকে পুঁজি করে সে এটি সম্ভব করেছে। কোন এক অখ্যাত কবরকে সালু দিয়ে ঘিরে সুন্দর গিলাফ দিয়ে ঢেকে সে গ্রামের পীর সেজে বসেছে এবং সকলের সম্মান ও ভক্তি পাচ্ছে। সুতরাং মাজার হচ্ছে তার অস্তিত্বের ভিত্তি। এ মাজারের কোন রকম অনাদর বা অবহেলা তার কাম্য হতে পারে না। এজন্য যখন এক রাতে মোমবাতির আলোয় যখন সে দেখল যে গিলাফের রূপালি ঝালরের এক প্রান্তের সূতা খসে গেছে তখন সে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং মনে দুঃখ অনুভব করে। মাজারের উজ্জ্বলতাই যদি কমে যায় তাহলে মজিদও ম্লান হয়ে পড়ে। মজিদকে টিকে থাকতে হলে মাজারের সৌন্দর্যও বজায় রাখতে হবে। মজিদ সে জন্য মাজারের সৌন্দর্য ঠিক রাখতে তৎপর। এটাই তার সৌখিনতা।

যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই।

আলোচ্য লাইনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে বন্ধ্যা মেয়েদের প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে।

মজিদের চক্রান্তে বন্ধ্যা স্ত্রী আমেনা বিবিকে খালেক ব্যাপারী তালাক দিয়েছে। তালাক দেয়ার পর ব্যাপারীর মনের শান্তিও নষ্ট হয়েছে। মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে সে চায়। সেজন্য মসজিদ তৈরির বারো আনা খরচ সে নিজে করতে চায়। দুনিয়াদারিতে তার আর মন নেই। কিন্তু সন্তান না হওয়ার জন্য আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া কি সমীচীন হয়েছে। এ ব্যাপারে সমাজ বড় নিষ্ঠুর। সন্তান না হলে স্বামীর ঘরে মেয়েদের আদর কমে যায়। এ মেয়েকে সমাজ ভাবে অপয়া। আমেনা বিবি বন্ধ্যা হওয়ায় ব্যাপারী তার প্রতি যে খুশি ছিল তা নয়। সে দ্বিতীয় বিবাহ করতেও বিলম্ব করেনি এবং প্রথম সুযোগে আমেনাকে তালাক দিয়েছে। বন্ধ্যা মেয়েরা যে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয় আমেনা বিবির ঘটনাই তার প্রমাণ। সে জন্য বাজা মেয়ে যে ঘরে রয়েছে সে ঘরে স্বস্তি থাকার কথা নয়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মজিদের বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- মজিদের আরেক সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিলো ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গুম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এ দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোন এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিলো। এ মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিলো ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে, এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিলো তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দরুদ পড়ছিলো মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নাবিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মত মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালু কাপড়টা এক কোণে উল্টে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মত ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের্ ান আলোয় কবরের সে অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মত দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এ কবরই, কিন্তু সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে ওঠেছিলো, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার একে। কবরের কাপড় উল্টানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গবোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মত আদিঅন্তহীন–যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহীমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহীমা কোন প্রশ্ন করে না।, কিন্তু মনে-মনে ভাবে।

এক সময়ে মজিদই বলে,

–বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকতো!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহীমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে, –আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

–নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া-দেয়। মহড়া-দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে ওঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মত তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহীমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

—আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিতো!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মত দেখাচ্ছিলো। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিলো যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরীফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মসূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মত অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান-পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে– তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহীমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিলো। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহীমাকে বলে,

—বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্যে রহীমা পা-টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

—বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম? সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহীমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোন উত্তর আসে না মুখে।

রহীমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী কও?

—আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহীমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তসারশূন্যতা এ মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্তবড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

সুদৃশ্য – দেখতে সুন্দর। **দুস্থ** – দীন, দুঃখী। **গুম্বুজ** – গম্বুজ, মসজিদ ইত্যাদির ওপরে গোল চূড়া। **তদারক** – দেখাশোনা। **পাগলা হাওয়া** – এলোমেলো হাওয়া। **ঝকঝকে রোদভাসা** – রোদে উজ্জ্বল। **জমজমাট** – সরগরম। **মথিত** – আন্দোলিত। **দমকা** – হঠাৎ জোরে সঙ্গে আসা। **অতিক্রান্ত** – ফেলে আসা। **নিরাকপড়া** – একটুও হাওয়া নেই এমন। **জোতজমি** – সম্পত্তি। **সম্মান-প্রতিপত্তি** – মর্যাদা ও ক্ষমতা। **সচ্ছলতা** – প্রাচুর্য। **শিকড়গাড়া** – শিকড় মাটিতে অনেকটা ঢুকে যাওয়াতে গাছের শক্ত অবস্থান। **বিসদৃশ** – অন্য রকম। **ঠক্কর** – ধাক্কা, আঘাত। **সমৃদ্ধি** – টাকা পয়সা ও সম্পত্তির উন্নতি। **যশমান** – সুনাম ও সম্মান। **চিরশায়িত** – চিরকাল শুয়ে থাকা। **নিঃসঙ্গ** – একাকী। **আদি অন্তহীন** – যার শুরু নাই শেষও নাই, বিশাল, সীমাহীন। **অপলাপ** – মিথ্যে কথা। **স্বল্পভাষিনী** – যে স্ত্রীলোক কম কথা বলে। **চড়িয়ে** – উপড়ে তুলে। **মোটা তাজা** – স্বাস্থ্যবান। **নিজের রক্ত** – নিজের ছেলেমেয়ে। **মহড়া** – প্রস্তুতি। **জন্মের ঠিক** – জন্ম অবৈধ। **ব্যথাবিদীর্ণ** – ব্যথায় ছিড়ে গিয়েছে এমন। **নিছক** – খাঁটি। **অনাবৃত** – আঢাকা, খোলা। **পুষ্যি** – পোষ্য, দত্তক। **উপভোগ** – তৃপ্তির সঙ্গে যাপন। **ঢাকা** – বিস্তৃত। **পিচ্ছিল** –

পিছলা। **রেশ** – অনুরণ; তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর শেষে কিছুক্ষণ যে শব্দ থাকে। **আওয়া ঘর** – বসার ঘর। **কদু** – লাউ। **পলক** – নিমেষ। **নিষ্ফলতা** – ব্যর্থতা। **অন্তসারশূন্যতা** – ভিতরটা শূন্য এমন ভাব।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত – আমাদের যদি ছেলে-পিলে থাকত।

পোলা – ছেলে।

তোমার একটা সাথী আনুম – তোমার একটি সঙ্গী আনব।

কী কও – কি বল।

আপনে যেমুন বোঝেন – আপনি যেমন বোঝেন।

পাঠসংক্ষেপ

মসজিদ তৈরি হতে থাকে। ফাল্গুনের এলোমেলো হাওয়াতে তার মনে ভাবান্তর আসে। অনেক বছর ধরে সে এখানে আছে। এখানে জায়গাজমি ও মানমর্যাদাসহ সে পাকাপোক্ত হয়ে আছে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে মাজারটি। সালু কাপড়ের এক অংশ বাতাসে উল্টে আছে। কার কবর এটি? মজিদ জানে না।

রাতে ঘুমাবার সময় মজিদ রহীমাকে বলে, যদি তাদের ছেলেপিলে থাকতো। হাসুনিকে দত্তক নেয়ার প্রস্তাব মজিদ উড়িয়ে দেয়। মজিদের মনে হয় জীবনটাকে সে উপভোগ করেনি। পরদিন মজিদ রহীমাকে জানায়, সে রহীমার সাথী আনবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে-সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ফাল্গুনের দমকা হাওয়া মজিদের মনে কোন্ ভাব জাগায়?
২. কবরটি মজিদকে ভীত করে তোলে কেন?
৩. রাতে মজিদ রহীমাকে কি বলে? রহীমার উত্তর কী ছিল?
৪. ‘মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি’। কথাটার অর্থ কী?
৫. মাজারের অনাবৃত কোন দেখে মজিদের কী মনে হয়?
৬. মজিদ দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চায় কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ফাল্গুনের দমকা হাওয়া মজিদের মনে কোন্ ভাব জাগায়?

উত্তর : ফাল্গুনের দমকা হাওয়া মনকে বেদনাময় করে তোলে। হাওয়াতে ধুলি উড়াতে দেখে মজিদের মনে হয় ফেলে আসা দিনগুলির কথা। এ দেশে সে বহুদিন ধরে বসবাস করেছে। দশ বারো বছর তো হবেই। একসময় সে টাকা পয়সাহীন গরীব মানুষ হিসেবে সে এ গ্রামে এসেছিল, কিন্তু আজ তার অনেক জায়গা জমি এবং মান মর্যাদা ও

ক্ষমতা। ভবিষ্যতে এগুলো ঠিকই থাকবে। এখন সে বাতাসে উড়ে যাওয়া পাতা নয়, মাটিতে শিকড় গাড়া গাছ। সে এখন সচ্ছল মানুষ।

প্রশ্ন : কবরটি মজিদকে ভীত করে তোলে কেন?

উত্তর : বাতাসে কবরের সালু কাপড়ের এক অংশ উল্টে যায়। সেই অনাবৃত অংশ যেন মরা মানুষের খোলা চোখের মতো ঠেকে। এ কবরই মজিদের মান সম্মান ও অর্থবিত্তের মূলে। কিন্তু এ কবরের ভিতরে যে শায়িত আছে মজিদ তাকে চেনে না। অথচ এ কবরের সঙ্গেই সে গত দশ বারো বছর বসবাস করে আসছে। এ কথা ভাবতে ভাবতে মজিদ শিউরে ওঠে।

প্রশ্ন : রাতে মজিদ রহীমাকে কি বলে? রহীমার উত্তর কি ছিল?

উত্তর : রাতে ঘুমাতে গিয়ে রহীমা মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। মজিদ রহীমাকে বলে যদি তাদের ছেলে থাকত। সন্তানের বড় অভাব অনুভব করে মজিদ। রহীমা উত্তর দিতে গিয়ে জানায় তার ইচ্ছে হাসুনিকে পুষ্যি রাখা। হাসুনির উপর তার মায়া পড়েছে। হাসুনি স্বাস্থ্যবান ছেলে।

প্রশ্ন : 'মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি'। কথাটার অর্থ কী?

উত্তর : মজিদ ছেলেপিলে চায়। কিন্তু রহীমা বাজা মেয়ে। তার সন্তান হবে না। সে রাতে এ নিয়ে কথাবার্তা বলার পর যখন দুজনে চুপ হয়ে যায় তখন রহীমা ভাবতে বসে। মজিদ আর কথা বলে না নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু মজিদের নীরবতা রহীমার কাছে পাথরের মতো ভারি মনে হয়। সে নীরবতার মধ্যে যেন বঞ্চনা রয়েছে সন্তান না পাওয়ার হাহাকার আছে। সে জন্য ঐ নীরবতা অসহনীয়।

প্রশ্ন : মাজারের অনাবৃত কোন দেখে মজিদের কি মনে হয়?

উত্তর : মাজারের অনাবৃত কোণ দেখে মজিদের মনে হয় ওটি যেন মৃত মানুষের চোখ। তখন সম্ভবত মৃত্যুর কথা তার মনে পড়ে। এ মৃত্যুর প্রসঙ্গে মজিদ ভাবে জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ করতে না পারলে টাকা পয়সা, সম্পত্তি ও সম্মান অর্থহীন। এত পরিশ্রম করে আরাম আয়েশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখারও কোন মানে হয় না।

প্রশ্ন : মজিদ দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চায় কেন?

উত্তর : মজিদ রহীমাকে বলে তার জন্য সে সাথী আনবে। অর্থাৎ সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। সম্ভবত সে সন্তান চায়। কেননা রহীমা তাকে সন্তান দিতে পারেনি, সে বন্ধ্যা মেয়ে। একটি সন্তানের জন্য আকুল তাই মজিদকে দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী করে। তাছাড়া রহীমাও একা। আরেকটা মেয়ে আসলে ঘর ভরে উঠবে। এগুলো মজিদ বলে। আমলে তার দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছাকে এভাবে যুক্তিসঙ্গত করতে চায় সে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতার শিকড় গাড়া বৃক্ষ।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের পাকাপোক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বহুদিন আগে ভাগ্য অন্বেষণে মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে এসেছিল। তখন সে ছিল একেবারে নিঃস্ব। কিন্তু এটি মাজারকে কেন্দ্র করে সে এ গ্রামে অর্থবিত্ত করেছে এবং খোদার মানুষ হিসেবে সে সকলের শ্রদ্ধাও পেয়েছে। অর্থাৎ এ

গ্রামে তার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা একটি উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ঝড়ে পাতা ওড়ে যায়, কিন্তু শক্ত শিকড়ওয়ালা গাছকে ঝড় উপড়ে ফেলতে পারে না। মজিদও গাছের মতো এ গ্রামের মাটিতে শক্তভাবে শিকড় গেড়েছে। কেউ তাকে সরাতে পারবে না।

ইউনিট ৮

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

☞	মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথি-এর হৈহুলস্থুল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিলো যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

–হে নামাজ জানে নি?

রহীমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

–জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহীমা সরাসরি উত্তর দেয়,

–পড়বো আর কি ধীরে-সুস্থে,

–তোমার হে মানসম্মান করে নি?

–করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে–এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিলো।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনে নি। রহীমা জোরে হাসে না। সালু আবৃত মাজারের আশে-পাশে যারা আসে তারাও কোনদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মত হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো। এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-বা কবে মজিদ এমন হাসি শুনেছে। জীর্ণ গোয়ালঘরের মত মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্ন-সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মত মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

—কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহীমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহীমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহীমা বলে,

—জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মত ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

—একটা মজার কথা মনে পড়লো বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহীমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—কী কথা বইন?

—কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

—কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

—তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

—কারে দেখাইছিল?

—আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দুৎত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর—হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে—আর, এখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না। রহীমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোন কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারি হয়ে থাকে। রহীমার অলক্ষে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তার পর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহীমা যেমন চমকে ওঠেছিলো তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝোঁকে চোখ নাক মোছে।

রহীমা আস্তে বলে,

–কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহীমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহীমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিলো এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহীমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে–পূর্বাহ্নে তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহীমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মত চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিলো। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মত ভেঙে খান-খান হয়ে গেলো। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণ তা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, –সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে। –ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রুহ-এর জন্য দোয়া করা, সে যেন বেহেস্তে স্থান পায়, তার গুণাহ যেন মাফ হয়ে যায়–তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মত মুখ চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুস নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরে আগে মজিদকে নিকটে কোন একস্থানে যেতে হয়েছিলো, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মত বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশ নাই।

রহীমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিড়িতে এসে বসে। রহীমার হাত থেকে হুকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

–ওইটার হইছে কী?

রহীমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

—মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—কিন্তু .... ক্যান খারাপ করছে?

রহীমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ায় হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোন লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী—তবে না হয় বুঝতো মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢঙ? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মত হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বলা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহীমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

দানা-দানা – ছোট ছোট গোল আকারের। **অনাড়ম্বর** – জাঁকজমকহীন। **মেহমান** –অতিথি। **হৈহলুস্থুল** – হট্টগোল, চীৎকার, ব্যস্ততা। **সংগোপনে** – অতি গোপনে। **সারা** – শেষ। **ভুরভুর** – ভরপুর, সবদিকে ভরে যাওয়া। **ধীরে-সুস্থে** – আস্তে ধীরে। **আড়াল** – গোপন। **মিহিসুন্দর** – অতি সূক্ষ্ম, চমৎকার। **চমকিত** – বিস্মিত। **রোল** – আওয়াজ, শব্দ। **জীর্ণ** – পুরাতন। **গোয়াল ঘর** – গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর থাকার জায়গা। **খিটখিটে** – বদমেজাজী। **তারস্বরে** – উঁচুস্বরে। **আম সিপারা** – আমপারা, ত্রিশ খন্ড কোরানের শেষ খন্ড। **অন্ন-সংস্থান** – খাবার জোটানো। **তিক্ততম** – সবচাইতে দুঃখজনক। **সংগ্রাম** – যুদ্ধ। **আভাস** – পরিচয়, চিহ্ন। **টান** – শক্ত। **রুষ্টতা** – রাগের ভাব। **আড়ষ্ট** – জড়োসড়ো। অবিশ্রান্ত। **মরণাপন্ন** – মুমূর্ষ। **ঝাড়তে** – দোয়া পড়ে গা ফুঁ দিতে। **অনাবিল** – স্বচ্ছ, পরিষ্কার। **সমাপ্তিহীন** – শেষ নেই এমন। **ধারা** – প্রবাহ, গতি। **বুবু** – বড় বোন বা বোনের মত জ্যেষ্ঠদের সম্বোধনবাচক শব্দ। **মস্করা** – ঠাট্টা। **কৌতুক** – রঙ্গ রসিকতা, ঠাট্টা। **দুলা** – বর। **দুলার বাপ** – শ্বশুর। **সংযত** – নিয়ন্ত্রিত। **ছলছল** – চোখের জল আসার ভাব। **নিদারুণ** – খুব বেশি। **অভিমান** – নিকট জনের বিরুদ্ধে রাগ। **অলক্ষ্যে** – গোপনে, কেউ দেখে না এমন। **পশলা** – বর্ষণ, এখানে চোখের পানি পড়া। **নুলা** – হাত বিকল হয়েছে এমন। **হদিশ** – ঠিকানা। পূর্বাহ্নে – আগে ভাগে। **ইঙ্গিত** – আভাস। **দুষ্কর** – কষ্টসাধ্য। **খ্যাংটা** – মেজাজ গরম, খিটখিটে। **আর্তনাদ** – কাতর চীৎকার। **বিলাপ** – টানা সুরে কান্না। **অভিযোগ** – নালিশ। **যাদু** – ছোট বাচ্চা। **কোমল** – নরম। **খান খান** – টুকরো টুকরো। **পেয়ারের** – আদরের। **জলদি** – তাড়াতাড়ি। **প্রস্থান** – ফিরে যাওয়া। **রুহ** – আত্মা **গুণাহ** – পাপ। **মাফ** – ক্ষমা। **নছিহত** – ধর্মীয় উপদেশ। **হুস** – জ্ঞান। **চৌকাঠ** – দরজার কাঠের ফ্রেম। **ঝুরে আসা চোখ** – কান্নায় কাতর চোখ। **বদনা** – সং বর্ধনী। পানি রাখার এক ধরনের নলযুক্ত পাত্র। **খড়ম** – কাঠের পাদুকা। নড়চড় – নড়াচড়া। **পিড়ি** – কাঠের আসন। **লক্ষণ** – চিহ্ন, আভাস। **দায়িত্ব** – কর্তব্যের ভার। **চিনচিনে** – সূক্ষ্ম। **মস্ত** – বিরাট। **একরত্তি** – এতটুকু। **ঢঙ** – ভঙ্গি। **ঠাটাপড়া** – বাজপড়া, বজ্রাহত। **গর্জন** – রাগ প্রকাশের উচ্চ চীৎকার। **মড়ক** – মহামারি। **বলা** – বিপদ আপদ, রোগ। **অবসন্ন** – শ্রান্ত, ক্লান্ত।

বিশিষ্টার্থক ব্যবহার

চুকে যায় – শেষ হয়।

যেন ঠিক বেড়াল ছানা – বিড়ালের বাচ্চার মতো অতি নিরীহ।

ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে – ভয়েই মরে যাবে।
তার মুখে কথা ফুটতে থাকে – কথা বলতে শুরু করে।
ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল – নিজের মধ্যে রেখেছিল।
বরফ গলা নদীর মত – জমাট দুঃখের প্রকাশ।
মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে – রাগে মুখ কঠিন হয়।
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানো – গুরুতর কিছু ভাবনার ভঙ্গি।
গলা পর্যন্ত ওঠে ভারি হয়ে থাকে – রাগ বা অভিমান প্রকাশ করতে না পারার জন্য গলায় যন্ত্রণা।
পশলাটি কেটে গেলে – কান্না শেষ হলে।
সাতকুলে কেউ নেই – বংশধর নেই।
চোখের মনি – অতি আদরের ছেলে।
সকালটা যেন কাঁচের মত ভেঙে খান খান হয়ে গেল – সকালের সুন্দর সময়টা নষ্ট হয়ে গেল।
নছিহতে কান নেই – উপদেশ শোনে না।
শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে – অতিমাত্রায় শোকাকুল হয়েছে।
আশ-পাশের দিশ নাই – আশপাশ সম্পর্কে সচেতনতা নাই।
পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতা – পার্থিব জীবন নিয়ে বোধশূন্যতা।
সংসার উচ্ছন্নে যাক – সংসার নষ্ট হোক।
বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে – অতিরিক্ত ভয় পায়।
ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে – অত্যন্ত ভয় পাবে।
মনে শাশুড়ির ভাব জাগে – শাশুড়ি যেমন বালিকা বউকে আদর করে, রহীমার মনেও জমিলা সম্পর্কে সে ধারণা হয়।
চোখ পর্যন্ত তোলে না – খুবই শান্তশিষ্ট ও লজ্জাশীলা হয়ে থাকে।
আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে – প্রকৃত স্বভাব বেরিয়ে আসতে থাকে।
ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল – গোপন করে রেখেছিল।
দুঃখ বেদনা বরফ গলা নদীর মত – বরফ গললে যেমন নদী হয়, মানুষের দুঃখ বেদনাও যেন গলে গিয়ে পানি হয়।
মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে – খুব রেগে যায়।
হাসিতে ফেটে পড়লো – অতিরিক্ত হাসলো।
ভারি হয়ে থাকে – আটকে থাকে।
মনের হদিশ পাওয়া যায় না – মন বোঝা যায় না।
সাত কুলে কেউ নেই – বংশের কেউ নেই।
চোখের মনি – অতি আদরের
শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে – বেশি রকম শোক হয়েছে।
ঠাটা পড়া মানুষের মত হয়ে গেছে – বাজ পড়া মানুষ যেমন প্রাণহীন তেমনি।
বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে – বেশ ভয় পায়।
দাউ দাউ করা শিখার মত সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে – খুব বেশি উত্তেজিত হয়।

আঞ্চলিক শব্দ ও ব্যাক্যাংশ

পড়বো – পড়বে, **ভালা** – ভালো, **কইরা** – করে, **মাইয়া** – মেয়ে, **হুনে না** – শোনে না

হুনলা নি – শুনেছ কি?, **আওয়াজ কইরা হাসন নাই** – আওয়াজ করে হাসতে নেই, **জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো** – জোরে হেসো না বোন, মানুষ শুনবে, **বইলাই** – বলেই, **তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায়** – তিনি যখন আমাকে বিয়ে করতে আসেন, **তানারে দেখাইছিল** – তাঁকে দেখিয়েছিল, **তয় দেইখা আমি কই** – তখন দেখে আমি বলি, **দ্যুত** – ধ্যুৎ- অবিশ্বাস প্রকাশের শব্দ, **কাঁদো ক্যান বইন** – কাঁদো কেন বোন, **ওইটার হইছে কি** – ওটার হয়েছে কি?, **ছেমড়ি** – মেয়ে, **থিকা** – থেকে, **আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে** – আমর দরজা থেকে উঠতে বল তাকে, **আনবার** – আনতে।

পাঠসংক্ষেপ

জ্যৈষ্ঠ মাসে মসজিদের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই মজিদ কোন বড় আয়োজন না করে দ্বিতীয় বিয়ে সেরে ফেলে। নতুন বউ অল্প বয়সী, দেখতে অতি নিরীহ গোছের, নাম জমিলা। জমিলাকে খুব পছন্দ হয় রহীমার। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে জমিলার স্বাভাব বোঝা যায়। সে বেরিয়ে আসে ঘোমটা থেকে, কথা বলে অনবরত এবং হাসতে থাকে। মজিদ বিচলিত হয়। এ রকম হাসি সে কখনো শোনে নি। মাজারে কেউ কখনো হাসে না। মজিদের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও জমিলার হাসি বন্ধ হয় না। একদিন হেসে হেসে জমিলা রহীমাকে বুঝিয়ে দেয় যে মজিদ তার শ্বশুরের মতো, আর রহীমা তার শাশুড়ির মতো। জমিলা শুধু হাসে না, কাঁদেও। জমিলার রকম-সকম মজিদকে ভাবিয়ে তোলে। জমিলার মনের হদিস পাওয়া মুশকিল। একদিন এক খিটখিটে বুড়ি মজিদের কাছে বিপুল আর্তনাদ করে তার মৃত ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার চীৎকার জুড়ে দেয়। সেটি দেখে জমিলা কেমন পাথরের মত হয়ে যায়। সে মন খারাপ করে চৌকাঠে বসে থাকে। মজিদ এসব একেবারে পছন্দ করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজিদের নতুন বউয়ের নাম কী? তাকে পেয়ে রহীমার কী ভাব জাগে? মজিদ ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায় কেন?
২. জমিলার ব্যাপারে রহীমা ও মজিদের ভুল ভাঙে কখন?
৩. মজিদ কি জন্য চমকিত হয়?
৪. ‘তানি বুঝি দুলার বাপ।’ – কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।
৫. জমিলা কাঁদে কেন?
৬. খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে কী ফরিয়াদ জানাল? মজিদ তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দিল?
৭. ‘জমিলা যেন ঠাটা পড়া মানুষের মত হয়ে গেছে’। এ বাক্যটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
৮. কয়েকটি নতুন শেখা শব্দ অর্থসহ সাজিয়ে লিখুন।

প্রশ্ন : মজিদের নতুন বউয়ের নাম কী? তাকে পেয়ে রহীমার কী ভাব জাগে? মজিদ ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায় কেন?

উত্তর : মজিদের নতুন বউয়ের নাম জমিলা।

জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। জমিলার প্রতি তার স্নেহ জাগে, মেয়ের মতো মনে হয় তার। এভাবে যতই সে দেখে ততই জমিলাকে তার ভালো লাগে।

ওদিকে জমিলার মতো একটি তরুণী মেয়েকে বিয়ে করতে পেরে মজিদ খুব খুশি হয়। এ বয়সেও তার মনে বরের ভাব জাগে। সেজন্য সে দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলায়।

প্রশ্ন : জমিলার ব্যাপারে রহীমা ও মজিদের ভুল ভাঙে কখন?

উত্তর : জমিলার ব্যাপারে মজিদ ও রহীমার ভুল ভাঙল অল্প দিনের মধ্যে। প্রথমে জমিলাকে খুব নিরীহ বিড়াল ছানার মতো মনে হয়েছিল। চুপচাপ শান্ত শিষ্ট হয়ে রয়েছিল সে প্রথমে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে ঘোমটার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। হাসতে ও কথা বলতে শুরু করে। তার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল সে অনেক কিছু জানে, এতদিন প্রকাশ করেনি। তখনই মজিদ ও রহীমা জমিলাকে বুঝতে পারল।

প্রশ্ন : মজিদ কি জন্য চমকিত হয়?

উত্তর : একদিন মজিদ বাইরের ঘর থেকে জমিলার হাসির ঝঙ্কার শোনে। এতেই মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘদিন সে এখানে বাস করছে। কিন্তু কোনদিন সে এমন হাসি শোনে নি। মাজারে যারা আসে তারা কেউ হাসে না। তারা দুঃখের ফরিয়াদ নিয়ে আসে, প্রবলভাবে কাঁদে। এখানে বুকফাটা বেদনা জাগে। কে হাসবে এখানে? তাছাড়া শৈশব থেকে মজিদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কোনদিন এমন করে কেউ হাসে নি।

প্রশ্ন : 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' – কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : উক্তিটি জমিলার। রহীমাকে সে একথা জানিয়েছে। বিয়ের আগে জমিলার খোদেজা বুবু মজিদকে দেখিয়েছিল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। মজিদ দাড়িওয়ালা বয়সী মানুষ। তাকে দেখে জমিলা ভেবেছিল এ লোক নিশ্চয়ই বরের বাপ। কিন্তু এর সঙ্গেই তো তার বিয়ে হল। আসলে এরকম পিতৃতুল্য অসমবয়সী মানুষকে জমিলা স্বামী হিসেবে ভাবতে পারিনি। তার দুঃখের কথা, অপছন্দের কথা হাসতে হাসতে সে রহীমাকে জানিয়েছে।

প্রশ্ন : জমিলা কাঁদে কেন?

উত্তর : জমিলা শুধু হাসে না, জমিলা কাঁদেও। পাটি বোনার সময় জমিলা কাঁদে, চোখ-নাক মোছে। জমিলা কি জন্য কাঁদে তা সে বলতে চায় না। একটা মিথ্যা কথা বলে রহীমাকে। তার এক নুলো ভাইকে ফেলে আসার জন্য তার মন খারাপ হয়েছে, সে জন্য সে কাঁদে। আসলে সে কাঁদে তার ভাগ্যের জন্য। এ রকম বুড়ো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হল কেন? সে জন্য এখানকার পরিবেশের সঙ্গ সে খাপ খাওয়াতেও পারে না। সে কারণে কাঁদে।

প্রশ্ন : খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে কি ফরিয়াদ জানাল? মজিদ তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দিল?

উত্তর : কানের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীব্র চীৎকার জুড়ে দিল। সে বিলাপ করতে লাগল ভয়ানক ভাবে। তার একমাত্র ছেলে মারা গেছে। বংশে বাতি জ্বালানোর কেউ নেই তার। সে কেঁদে কেটে মজিদের কাছে ফরিয়াদ করে, আল্লাহ যেন তার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেয়।

মজিদ তাকে শোক না করতে বলে। সে বুড়িকে এ বলে সান্ত্বনা দেয় যে, যারা খোদার খুব পেয়ারের, খোদা তাদের তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে তুলে নেয়। এখন বুড়ির উচিত ছেলের রুহের জন্য দোয়া করা।

প্রশ্ন : 'জমিলা যেন ঠাটা পড়া মানুষের মত হয়ে গেছে'। এ বাক্যটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : জমিলা অল্পবয়সী একটি বালিকা। তার জীবনে বাসনা কামনা আছে। কিন্তু সে জীবনকে যেভাবে ভেবেছিল তার জীবন সেভাবে হল না। তাকে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হল পিতার বয়সী এক বুড়ো লোকের সঙ্গে। যার এক বউ আগে থেকেই আছে। সব মিলিয়ে তার জীবন তার কাছেই কৌতুককর মনে হয়। কিন্তু সে প্রাণ খুলে হাসতেও পারে না। মজিদের শাসন চলে সর্বক্ষণ। খ্যাংটা বুড়ির ছেলের জন্য জমিলারও মন খারাপ হয়। মজিদ ওসব বোঝে না। মন খারাপ হলে দুনিয়াদারির কাজ কি চলবে না। কিন্তু জমিলা পাথরের মতো হয়ে গেছে যেন। কোনদিকে তার হুঁশ নেই। বজ্রাহতের মতো হয়ে গেছে সে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

বিবিত্রভাবে জীবন্ত হাসি, ঝরণার অনাবিল গতির মত ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

এ অংশটি নেওয়া হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে। জমিলার হাসির রূপ এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

জমিলা মজিদের দ্বিতীয় বউ হিসেবে এ বাড়িতে এসেছে। মজিদের সঙ্গে তার বয়সের বিরাট ব্যবধান। মজিদ তার পিতার বয়সী। কিন্তু এর সঙ্গে তার বিয়ে হওয়াই হাসির বিষয়। সে কথা রহীমাকে বলতে গিয়ে জমিলা দারুনভাবে হেসে ওঠেছে। হাসতে হাসতে সে লুটিয়ে পড়েছে। হাসি আর থামে না। তার হাসি জীবন্ত। ঝরণা যেমন স্বচ্ছ গতিতে ছন্দময় ভঙ্গিতে এড়িয়ে চলে এবং কোথায় তা থামবে জানে না, জমিলার হাসিও তেমনি, বাধাহীন, অন্তহীন। আসলে জমিলার এ হাসি তার জীবনেরই প্রতি একটি প্রচণ্ড কৌতুক।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ♦ জমিলাকে নির্যাতন করার একটি ভাষাচিত্র অঙ্গন করতে পারবেন।
- ♦ চিদ্রোহী জমিলার চরিত্রের একটি দিক বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কুল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে—এ ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এ দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মত চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মত ধারোলো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে-মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এ মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খা-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকি-ধিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনলো? যার কচি-কোমল লতার মত হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মত ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো—তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারি হয়ে এলো তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেলো। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝলো না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসলো। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

পাশের বারান্দার মত ঘরটায় রহীমা শোয়। সেখানেই রহীমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁট একটু নড়ে উঠলো–যেন মাই খেতে-খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিলো, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হলো সে-কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহীমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহীমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহীমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

–জমিলা কই?

–ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এ নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দুরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

–ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মত খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছে নি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিলো, তবু টান হয়ে বসেছিলো আধ ঘণ্টার মত। তারপর কোন প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহীমা পেছনে ছাপড়া দেয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিলো বলে সে-কথা সে জানে না।

–কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

–বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ঐসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহীমা নিরুত্তরে ভুষি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহীমা যখন ধীরে-ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মত। সে-ঘুম ভাঙে না। রহীমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এ সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহীমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে ওঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোন কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোন দিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ–যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিলো বলে–সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মত ঘুরতে থাকে, ফুসঁতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহীমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহীমা বলে

–ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কী রাগ করা যায়?

–রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এ বাড়িতে আলহাদের জায়গা নেই। এ বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এর পর কী করবে। হঠাৎ এমন এ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

–ওর দিলে খোদার ভয় নেই। এটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান-পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে–দাঁতের আশে-পাশে ওপরে-নীচে। ঘষতে ঘষতে ঠোঁটের পাশের ফেনার মত থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই–মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক-থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে তারপর বলে,

–রূপ দিয়া কী হইব? মাইন্‌ষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনের বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

–তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছো, তা কী শক্ত গুণার কাম জানো নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কী ডরাও না, দোজখের আঁগরে ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

–তাছাড়া, এ কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি। এ ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এখানে তাঁনার রূহ-এর দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোন দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মত। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মত সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

ডোম – হিন্দু সমাজের একটি সম্প্রদায়। **ডোমপাড়া** – ডোমদের থাকার এলাকা। **ভোতা উত্তেজনা** – তীব্র নয় এমন উত্তেজনা। **আলগোছে** – মৃদুভাবে। **ঢোলক** – ঢোল। **অথই** – অতল, গভীর। **নিমজ্জিত** – ডোবা। **অতলতা** – গভীরতা। **নির্মম** – নিষ্ঠুর। **ভাতার** – স্বামী। **তলানি** – বিস্তৃতি। **খানিক** – অল্প। **সান্ত্বনা** – আশ্বাস দিয়ে শান্ত হওয়ার জন্য বোঝানো। **নিরন্তর** – একটানা। **স্ফুলিঙ্গ** – আগুনের কণা। **ছটা** – আলো, আভা। **ফালি** – টুকরো। **নিরবচ্ছিন্ন** – একটানা, অবিরাম। **ভারিত** – ওজনদার, গভীর। **অপেক্ষাকৃত** – তুলনামূলকভাবে। **অকম্পিত** – স্থির। **দেশলাই** – দিয়াশলাই। **কুপি** – বাতি। **প্রশস্ত** – চওড়া। **অঘোরে** – বেহুঁশের মতো। **মাই** – বুকের দুধ। **গোলায়** – মেশায়। **বলা-কওয়াতে** – বলে দেয়ার কারণে। **অভুক্ত** – উপোস। **টান** – সোজা। **ছাপড়া** – বাঁশ ছন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চাল। **নিরুত্তরে** – উত্তর না দিয়ে। **নাসারন্ধ্র** – নাকের ছিদ্র। **অধীরতা** – অস্থিরতা। **পেষনে** – চাপে। **কবজা** – ভয়ে দিশেহারা। **শ্রবণ শক্তি** – শোনার শক্তি। **রুষ্ট** – রাগান্বিত। **ল্যাট মেরে** – হাত পা ছড়িয়ে। ক্ষণকাল – অল্পসময়। **রাজত্বকাল** – রাজ্যশাসনের সময়। মহব্বতনগরে মজিদ রাজার মতোই। **ঝোঁক** – প্রবণতা। **নির্বিকারভাবে** – কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে। **হতবুদ্ধি** – বুদ্ধিহীন। **ফুঁসতে থাকে** – ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সচরাচর – সাধারণ। **রাগান্বিত** – ক্রুদ্ধ। **সমবেদনা** – অন্যের বেদনায় অংশী হওয়া। **সংস্কার** – পরিবর্তন, মেরামত। **সদিচ্ছা** – ভালো ইচ্ছা। **নির্ভেজাল** – খাঁটি। **আহলাদ** – আবদার। **ঠায়** – নড়াচড়া না করে। **আগ্নেয়গিরি** – যে পাহাড় থেকে আগুন ও গলিত পদার্থ বের হয়। **ছিপি** – যা দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করা হয়। **প্রতিদ্বন্দ্বী** – বিরুদ্ধ লোক, শত্রু। **অবলম্বন** – নির্ভর। **আদ্যোপান্ত** – আগাগোড়া। **সতর্কতা** – সাবধানতা। **পর্বতপ্রমাণ** – পাহাড়ের মতো উঁচু, বিরাট, বিশাল। **অন্দরে বাইরে** – ঘরের ভিতরে ও বাইরে। **ঘোলাটে** – ভালো দেখা যায় না এমন। **মনোযোগ সহকারে** – মন দিয়ে। **পাট করা** – বিন্যস্ত। **কড়া** – তীক্ষ্ণ । ঝলক – প্রখর আলোর তাপ। **মেছোয়াক করে** – মাজে। **ঘরময়** – সারা ঘরে। **গাছ-গাছলা** – বড় ছোট সব গাছ। **রগড়ে** – ডলে। **প্রতিচ্ছবি** – অনুরূপ ছবি। **থাক** – সিঁড়ির অংশ, ধাপ। **গুঁড়ি** – গাছের দেহ, কাণ্ড। **ক্ষীপ্রগতিতে** – অতি দ্রুত। **জাহেল** – মূর্খ, জ্ঞানহীন। **কিছিম** – রকম। **হাশর** – ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। **জবাবদিহি** – কৈফিয়ৎ, উত্তরদান। **গুণা** – পাপ, **দোজখ** – নরক। **মাজার পাক** – পবিত্র কবর। **গোস্বা** – রাগ। **সশঙ্কিত** – ভীত। **বিস্ফারিত** – বড় হওয়া, ফুলে ওঠা। **পূর্ববৎ** – আগের মতো।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের অর্থ

ছুরির মত ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ – ছুরির যেমন ধার থাকে, তীক্ষ্ণ বিলাপ ও যেন তেমনি ধার বিশিষ্ট।

কেমন হয়ে গেছে – অন্য রকম হয়ে গেছে।

অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয় – রাত বাড়তে থাকে।

আদর শুকিয়ে আছে – স্নেহ-প্রেম নেই।

মুখের অন্ধকারটা কেটে যায় – মুখটা খুশি খুশি হয়।

টান হয়ে বসেছিলো – ঘুম যেন না আসে সে জন্য সতর্ক থেকেছিল।

জমিলার ঘুম কাঠের মত – কাঠ যেমন অসাড় থাকে, জমিলাও অসাড় হয়ে ঘুমায়।

ওঠার নামটি করে না – উঠতেই চায় না।

দীর্ঘ রাজত্বকালে – মজিদ এতই শক্তিশালী যে মহব্বতনগরে সে-ই রাজা। দীর্ঘদিন সে এ গ্রামে রয়েছে।

আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায় – জমিলার ওপর মজিদের ভয়ঙ্কর রাগ হয়। কিন্তু জমিলার কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে মজিদ নিজের রাগ দমন করে।

কাঠের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা – মুখটা কঠিন রূপ ধারণ করে।

কান খাড়া করে রাখা – সতর্ক হওয়া।

দাউ দাউ করা শিখার মত সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে – সে খুব বেশি উত্তেজিত হয়।

পাঠসংক্ষেপ

সে রাতে কি একটা উৎসব উপলক্ষে ডোম পাড়ায় ঢোলক বাজে। মজিদ ও জমিলা শয্যা থেকে সে বাদ্য শোনে। জমিলার মনটা খারাপ হয়ে আছে ঐ শন চুল বুড়ির তীক্ষ্ণ বিলাপ শুনে। মজিদের সহজে ঘুম আসে না। মজিদের চিন্তা, হালকা কচি দেহ জমিলা এতখানি অবাধ্য কেন। মজিদ জমিলাকে আদর করে না। মধ্যরাতে ঢোলের আওয়াজে মজিদের ঘুম ভেঙে গেলে মজিদ দেখে জমিলা বিছানায় নেই। জমিলা তখন পাশের ঘরে রহীমার বুক লেপ্টে শুয়ে আছে। জমিলার ওপর মজিদের রাগ বেড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হলেই জমিলা ঘুমে ঢলে পড়ে। সে ঠিকভাবে নামাজও পড়তে পারে না। এতে মজিদ আরো ক্রুদ্ধ হয়। ঘুমন্ত জমিলাকে সে হ্যাঁচকা টান মেরে ওঠায়। জমিলা আবার ল্যাট মেরে বসে থাকে। মনে তার প্রবল বিদ্রোহ। মজিদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এত বড় অবাধ্যতা সে কল্পনাই করতে পারেনি। জমিলা কিন্তু মজিদকে তোয়াক্কাই করে না। মজিদ যখন জমিলাকে মাজার পাকের থেকে ঠিকভাবে আচরণ করার জন্য শাসায় তখন জমিলা বুঝতে পারে সে খাঁচায় ধরা পড়েছে। ভয়ানক উত্তেজিত হয় জমিলা কিন্তু পরে শান্ত হয়।

পাঠোত্তর মূলায়ন

প্রশ্ন : ১। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে, সে ঘরে আনল? –কে কাকে ঘরে আনার প্রসঙ্গ বলছে? নেশার লোভে' কথাটি বুঝিয়ে দাও।

উত্তর: মজিদ জমিলাকে বউ করে এনেছে, সে বিষয়ে বলা হচ্ছে।

জমিলা মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। অল্প বয়সী আকর্ষণীয়া তরুণী। মজিদ তার চেয়ে অনেক বড়। মজিদকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে জমিলার বেজায় আপত্তি। মজিদ যখন জমিলার বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পেল তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মহব্বত নগরে কেউ মজিদের অবাধ্য হয়নি। অথচ তার ঘরের মানুষ তাকে মানছে না। মজিদ জমিলাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। মজিদ জমিলাকে বিয়ে করার সময় ভেবেছিল এ হালকা দেহ কচি কোমল মেয়েটি তার কথামতো চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গেল উল্টো। এতে মজিদের মনে অনুতাপ জাগে। কাকে সে বিয়ে করল সে প্রশ্ন মনকে বিদ্ধ করে।

প্রশ্ন-২: জমিলা কোথায় ঘুমাচ্ছিল? মজিদ জমিলাকে কীভাবে ঘুমাতে দেখল?

উত্তর: জমিলা মজিদের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু মধ্যরাতে ঘুম থেকে ওঠে মজিদ দেখে জমিলা বিছানায় নেই। জমিলা পাশের ঘরে রহীমার সঙ্গে ঘুমাচ্ছিল। সে রহীমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে আছে। এমনভাবে গুঁজে আছে যে, মনে হয় সন্তান যেন মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার জন্য মুখ খুলেছে। কুপির আলোয় মজিদ জমিলাকে এভাবে ঘুমাতে দেখেছিল।

প্রশ্ন-৩: জমিলা এশার নামাজ পড়তে পারে না কেন এবং রাতে খাবার খেতে পারে না কেন? জমিলার ওপর রেগে গিয়ে মজিদ কি করল?

উত্তর: জমিলা একটু ঘুম কাতুরে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়। মগরবের নামাজ কোন রকমে পড়তে পারলেও এশার নামাজ সে পড়তে পারে না। খাবার খেতে পারে না এ কারণে। জমিলার ঘুম কাঠের মত অর্থাৎ জমিলা একবার ঘুমালে আর উঠবার নাম করে না।

জমিলা মজিদের কথা শোনে না। তদুপরি সন্ধ্যা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। এতে জমিলার ওপর মজিদ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। এক সন্ধ্যায় জমিলার এ রকম ঘুমানোর সময় মজিদ এক কাণ্ড করে বসে। হঠাৎ সে ঘুমন্ত জমিলাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওঠায়। জমিলার হাতকে সে এমন চাপ দেয় যে মনে হয় তা মড়মড় করে ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ৪। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।" – এটি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর: এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হল জমিলা। জমিলা মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। মজিদ খুব পছন্দ করে এ অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মজিদের ধারণা ছিল এ মেয়েটি তার অনুগত থাকবে। কিন্তু মজিদের হিসেবে ভুল হল। জমিলা পিতার বয়সী মজিদকে স্বামী হিসেবে মানতে পারেনি। নিজের জীবন সম্বন্ধে তার খুব দুঃখ হয়। জমিলা আনমনা হয়ে পড়ে। মজিদের নিত্য শাসনে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে বিদ্রোহ করে। মজিদের কোন কথাই সে শোনে না। গালমন্দ করেও কোন লাভ হচ্ছে না। মজিদের ব্যাপারে জমিলার কোন ভয় নেই। সব কিছু দেখে মজিদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। মহব্বত নগরের রাজা সে, কেউ কোনদিন তার বিরুদ্ধে যায় নি। কিন্তু জমিলা তাকে মানছে না। জমিলাকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে মজিদ দেখে। এ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন কীভাবে করবে তা সে ভাবে। তবে মজিদ খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন ৫। "রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক দিনের? কদিনেরই বা জীবন তার"? – এ কথাগুলো কার? এ কথাগুলো কেন বলা হয়েছে?

উত্তর: এ কথাগুলো মজিদের। দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলাকে শুনিয়ে মজিদ কথাগুলো বলেছে।

জমিলাকে কিভাবে শাসন করবে মজিদ ভেবে পায় না। তাকে পীড়ন করেও কোন লাভ হয় না। এতে জমিলা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মজিদ আশ পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, কিন্তু জমিলা তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। মজিদ অনুভব করে অল্পবয়সী তরুণী মেয়েটির মনে খোদার ভয় নেই, তার মনে এ ভয় ঢোকাতে হবে। এ জন্য মজিদ জমিলাকে রূপ যৌবনের অনিত্যতার কথা শোনায়। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষের রূপ যৌবনও চিরকাল থাকে না। মানুষকে পরকালে যেতে হবে। সেজন্য মানুষের মনে খোদাভীতি থাকা উচিত এবং সেইভাবে জীবনে আচরণ করা উচিত।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

সে চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই– মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। এ অংশে জমিলার কথা বলা হয়েছে। মজিদের কথা মতো চলার জন্য জমিলার ওপর পীড়ন করেছে, কিন্তু জমিলা বশে আসে নি। মজিদের কোন নিষেধই শোনে না। এখন তার সঙ্গে কথাও বলে না। পাশ দিয়ে চলে যায়, কিন্তু জমিলা তার দিকে তাকায় না। ভাবলেশহীনভাবে এক জায়গায় বসে থাকে। মজিদ আড়চোখে বউয়ের দিকে তাকায়। মজিদ দেখে জমিলার চোখে মানুষের ভয় তো নেই, খোদার ভয়ও নেই। সে ঠিকভাবে নামাজ পড়ে না, সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার মনে খোদার ভয় থাকলে জমিলা ঠিকভাবে আচরণ করত। মজিদের মনে হয়েছে, সে তাকে তো ভয় করেই না, খোদাকেও ভয় করে না।

কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। মজিদের ঘর করতে এসে জমিলার মনের যে অবস্থা হয়েছে তার বর্ণনা এখানে আছে।

পিতার বয়সী মজিদকে তরুণী জমিলা স্বামী হিসেবে পছন্দ করেনি। তা ছাড়া মজিদের নানা রকম শাসন ও উপদেশ জমিলাকে বিদ্রোহী করে তোলে। এতে মজিদ বিচলিত হয়ে পড়ে। সে তার তরুণী স্ত্রীর মনে খোদার ভয় জাগাতে চায়। জমিলা যে বাপ মায়ের কাছে শিক্ষা পায় নি সে কথাটি বলে। মজিদ জমিলাকে এ বলে শাসায় যে সে যার তার ঘরে বউ হয়ে আসেনি। মজিদ একজন পীর কামেল মানুষ। তার বউ হয়ে জমিলার এমন কাজ করা উচিত যাতে খোদা রাগ না করেন। এ সব কথায় জমিলা স্পষ্টভাবে বোঝে যে মজিদের ফাঁদে সে সম্পর্ণরূপে আটকা পড়েছে। ফাঁদের কাঁচা গোস্তে মুখ দেয়ার সঙ্গে খট করে আওয়াজ হয় এবং এতেই ইঁদুর বোঝে যে সে আঁটকা পড়েছে। জমিলাও হঠাৎ করে বুঝতে পারে সে ফাঁদে আটকা পড়েছে।

নিম্নলিখিত অংশের ব্যাখ্যা করুন

শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

ঘুমাইছে – ঘুমিয়েছে।

তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মত খ্যাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? – তুমি কাজ করবে, সে লালবিবির মত খাটে চড়ে ঘুমাবে বুঝি?, **লালবিবি** – লাল চেলি পরা নতুন বউ। **ফাইজলামি** – ফাজলামি। **ঘুম থিকা** – ঘুম থেকে। **পড়বার কও** – পড়তে বল। **বহুত হইছে** – অনেক হয়েছে। **কাইল** – কাল, গতকাল। **করছো** – করেছ। **ক্যামনে করলা** – কেমন করে করলে।

আঁগ – আগুন। দোজখের আঁগরে কী ডরাও না – দোজখের আগুনকে কি ভয় পাও না? **তাঁনার রূহ** – তাঁর আত্মা **তাঁনার দিলে** – তাঁর হৃদয়ে।

দ্বিরুক্ত শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার

'লালসালু' উপন্যাসের এ অংশে আমরা বেশ কয়েকটি দ্বিরুক্ত বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার দেখেছি। একটি শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে তা হয় দ্বিরুক্ত শব্দ আর সে শব্দ যদি কোন আওয়াজ অর্থাৎ ধ্বনি বোঝায় তাহলে তা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ। এ শব্দগুলো অব্যয় জাতীয়। এ শব্দগুলো ব্যবহার করে আমরা অনেক অব্যক্ত ভাবকে বোঝাতে পারি। এ শব্দগুলো বাংলা ভাষার সম্পদ।

আপনি এ পাঠের ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো জেনে নিন। লক্ষ্য করুন এগুলো ভাষায় কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টি বুঝলে আপনি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং অন্য পাঠের ধ্বন্যাত্মক শব্দও বর্ণনা করতে পারবেন।

খাঁ খাঁ – শূন্যতা, শূন্যতার কারণে অভাববোধ। **ধিকিধিকি** – অল্প অল্প আগুন জ্বলার ভাব। **চকচক** – উজ্জ্বলতার ভাব। **ভনভন** – মশা মাছি ইত্যাদির আওয়াজ। **গবগব** – বড় বড় গ্রাসে দ্রুত খাওয়ার আওয়াজ। **সোঁ সোঁ** – পানি বা পানি মেশানো খাদ্য খাওয়ার আওয়াজ, প্রবল বাতাসের শব্দ। **মড়মড়** – কাঠ, হাড় ইত্যাদি শক্ত জিনিস ভাঙার আওয়াজ। **দাউ দাউ** – উঁচু শিখায় জোরে আগুন জ্বলার শব্দ। **জবজব** – বেশি করে ভিজে যাওয়ার ভাব। **জ্বলজ্বল** – উজ্জ্বলতার রূপ। **থাক থাক** – একটার পর একটা থাক বা খাঁজ।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মাজারে জিকির অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখতে পারবেন।
- এ পাঠে জমিলার আচরণ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহীমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল মশলা এলো ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকের এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগলো। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘৎ খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে-ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মত। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এ যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে নাবতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মত তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে দুনে চড়ে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্ত রখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট, বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু-হু-হু। আবার : হু হু হু। আবার–

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহীমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মত নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন এক সময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে। বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহীমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মত ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মত মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহীমাকে ডাকে,

—বুবু!

রহীমা শোনে কী শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চীৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লন্ড-ভন্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারেনা। এবার ভেসে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদুৎগতিতে জমিলা ওঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে রুদ্ধ বৃক্ষের মত কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,

—বুবু!

এবার রহীমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মত বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে কেউ-বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মত রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে-ধীরে ওঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়। এক সময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

—পাগলী ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এ বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষীপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মত তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে-একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

–ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোন কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, –আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহীমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহীমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোন কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

–হে কই?

রহীমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ ওঠে চলে গেলো তারপর আর সে এদিকে আসে নি। আস্তে রহীমা বলে,

–বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

–ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহীমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিলো? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

–হে বাইরে গেছিলো?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

–হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহীমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মত জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবন্ত হুকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিলো মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহীমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মত মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বলা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে ওঠেছে সে-সংসার ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহীমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে–বিবি, শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহীমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলা নি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহীমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয়,

—তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহীমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখদুটো ভেজা মাটির মত নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহীমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,

—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জীগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়র কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট্ করে রহীমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে ওঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এ মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহীমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে-পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহীমা বলে,

—কী কমু? মাইয়াডা যানি কেমুন। পাগলী। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

শব্দার্থ ও টীকা

বাদ মগরেব – সন্ধ্যার পর। **শিরনি** – আল্লাহর দোয়া পাওয়ার জন্য মসজিদ, মাজার ইত্যাদিতে বিতরণের জন্য তৈরি খিচুড়ি, পায়েস কিংবা এ জাতীয় খাবার। **চড়ানো** – রান্নার জন্য ডেকচি চুলোর উপরে দেয়া। **ছুঁয়ে দিলে** – দোয়া পড়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে। **খিচুড়ি** – চাল-চাল মশলার মিশ্রণে রান্না করা অন্ন। **কাটা চুলা** – ওঠোনে কিংবা খালি জায়গায় কেটে গর্ত করে যে চুলা তৈরি হয়; অস্থায়ী চুলা। **ডেকচি** – হাঁড়ি। **জিকির** – সমবেতভাবে উচ্চস্বরে বারবার আল্লাহর নাম নেওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান। **অপরাহ্ন** – বিকেল। **গনগন** – আগুন জ্বলার শব্দ। **আগারবাতি** – ধুপকাঠি। **বিছানো... বসানো** – মিলাদে, জিকির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। যিনি মিলাদ পড়াবেন কিংবা জিকির পরিচালনা করবেন তিনি বিশেষ জায়গায় বসেন। তাঁর দুপাশে কখনো কখনো মোমবাতি জ্বালানো হয়। সামনে থাকে চালভর্তি একটি পাত্র। তাতে গুঁজে দেয়া হয় অনেকগুলো ধুপকাঠি। ধুপকাঠিগুলো পুড়তে থাকে, তাতে একটি সুরভিত ধমীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। **আলখাল্লা** – পা পর্যন্ত লম্বা ঢিলে পোশাক, জুব্বা। **আধা পাগড়ি** – ছোট করে বানানো পাগড়ি, মাথা সম্পর্ণ ঢাকে না এতে। **বিঘৎ খানেক লেজ** – পাগড়ির ছোট ঝোলানো অংশ। **পরস্পর** – একে অন্যে। **যোগশূন্য** – আলাদা, বিচ্ছিন্ন। **ঢিলে তেতালা** – আস্তে আস্তে। **সন্নিকট** – কাছে। **ধীরগতিশীল** – অল্পগতির, আস্তে আস্তে। **চাঞ্চল্য** – চঞ্চলতার ভাব। **আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব** – পাবে কি পাবে না এ নিয়ে মানসিক সংকট। **অস্তিত্ব** – সত্তা। **নিরুদ্বিগ্ন** – উদ্বেগশূন্য। নিষ্কম্প র কাঁপছে না এমন। **প্রতীক** – চিহ্ন। **অটুট** – যা ভাঙে না, শক্ত। **নিশ্চল** – যা চলে না, স্থির। **দুনে** – দ্বিগুণ হয়ে। **সংঘর্ষণে** – আঘাতে। অন্তর খনন – হৃদয়কে খোঁড়া। **বলকে বলকে** – উথলে উথলে। **দাহ্য-চেতনা** – পুড়বার ভাব। **হবে হচ্ছে** – হওয়ার উপক্রম। **ঘরবসতি** – ঘরসংসার। **ছারখার** – ধ্বংস। **নিশ্চিহ্ন** – চিহ্নহীন, বিলুপ্ত। **তদারক** –দেখা শোনা। **ভার** – দায়িত্ব। **কালো হাওয়া** – অন্ধকারের হাওয়া। **ভুরভুর** – পরিপূর্ণ। **বলক-ওঠা** – উথলান। **অশরীরী** – ভুতপ্রেত। **ধোয়া-পাকলা** – ধোয়ার কাজ। **লাকড়ি** – জ্বালানী কাঠ। **কাড়ে** – চিড়ে। **অবক্তব্য** – অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। **উত্তাল** – ভয়ঙ্কর। **অচম্বিতে** – হঠাৎ। **বালুতীরে** – সমুদ্রের বালুকাপূর্ণ তীরে। **বিভ্রান্ত** – দিশেহারা। **থই** –

তল। **উত্তুঙ্গ** – অতি উঁচু। **পর্বতপ্রমাণ** – পর্বতের মতো উঁচু। **অজস্র** – অনেক। **ছত্রখান** – টুকরো টুকরো। লন্ডভন্ড ধ্বংস। **মারাত্মক** – ভয়াবহ। **রুখতে** – বাধা দিতে। **বিস্মৃত** – ছড়ানো। **নিস্তরঙ্গ** – ঢেউহীন। **ঝলমল** – উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। **হট্টগোল** – গোলমাল। **অবশ পদযুগল** – অসাড় দুই পা। **সিক্ত** – ভেজা। **আলিঝালি** – অস্পষ্ট, আবছা। **অবসাদ** – ক্লান্তি। **বিমূঢ়** – হতভম্ব। **ভাগ** – চলে যাও। **দপদপ** – আগুন জ্বলার ভাব। **হল্কা** – তাপ। **বিদ্যুৎ ক্ষীপ্রতায়** – বিদ্যুতের গতিতে। **ক্ষয়িষ্ণু** – ক্ষয়ে যাচ্ছে যা। **মালুম** – ধারণা, অনুমান। **বেচইন** – অস্থির, চিন্তাগ্রস্ত। **চাওয়া-চাওয়ি** – দেখাদেখির কাজ। গোগ্রাসে – বড় বড় গ্রাসে। **বিসদৃশভাবে** – অসুন্দররূপে। **নিবন্ত** – যা নিভে যাচ্ছে। **বর্তন** – বড় থালা। **কর্কশ** – কঠিন, অমিষ্ট। **সিধা** – সোজা। **কিড়মিড়** – উত্তেজনায় দাঁত কামড়ানোর ভাব। **হনহনিয়ে** – তাড়াতাড়ি, দ্রুত গমন। **গুম** – গম্ভীরভাবে চুপ। **অক্ষুণ্ন** – যা এখন ক্ষুণ্ন হয়নি বা ভাঙেনি। **ঝিমঝিম** – মাধা ধরার ভাব। **বলা** – বিপদ, অসুখ বিসুখ। **ধুলিসাৎ** – ধুলিতে মেশা, ধ্বংস। **দাওয়া** – বারান্দা। **বদদোয়া** – অভিশাপ। **তড়িৎবেগে** – বিদ্যুৎগতিতে। **তওবা** – প্রশস্ত, বিরাট। **আনুগত্য** – অধীনতা। **ধ্রুবতারা** – ভোর বেলায়। **অনড়** – যা নড়ে না, শক্তি। **খুঁটি** – বাঁশ বা কাঠের লম্বা থাম যার ওপর ঘর দাঁড়িয়ে থাকে, অবলম্বন। **সত্তা** – অস্তিত্ব। **শীর্ণ** – রোগা, শুকনো। **পেশি** – দেহের মাংসপিণ্ড। **সহবাস** – একসঙ্গে বসবাস। **নির্ভেজাল** – খাঁটি। **পুলক** – আনন্দ। **শিহরণ** – কাঁপন। **ঝাপটা** – ধাক্কা, জোর। **এলেমদার** – জ্ঞানী, বিদ্বান।

বাক্যাংশের বিশিষ্টার্থক অর্থ

প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মত – সাগর যখন শান্ত থাকে, তখন ঢেউগুলো আস্তে গড়ায়, জিনিষের আওয়াজও যেন সেরকম।

পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে নাবতে শুরু করেছে – তারা এক সঙ্গে জিকির করবে।

দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে – এক এক জায়গায় এক একজন বসে আছে।

মহাসত্যের প্রতীক স্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল – বাঁধানো কবরটি মহাসত্যের চিহ্ন।

যে মহা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে – সবাই মিলে জিকির করার সময় মত্ততার সৃষ্টি হয়। এ মত্ততাকে বলা হচ্ছে মহা অগ্নিকুন্ড। একটু পরেই সে মত্ততা শুরু হবে।

অন্তর যখন গভীরতর হতে থাকে – অন্তরে গভীর ভাবের সৃষ্টি হয়।

পরস্পরের দাহ্য চেতনা এবার মিলিত হবে হচ্ছে করছে – জিকির করতে গিয়ে সবাই এক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়ামমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে – পার্থিব আকর্ষণ আর থাকবে না।

সে ঢেউয়ের গর্জন – জিকিরের আওয়াজ।

সে ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় – জিকির যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে।

এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ – জিকিরের বিরাট হল্লা বারবার শোনা যায়।

তারপর একটু পরে চীৎকার ওঠে – এটি জিকিরের চূড়ান্ত অবস্থা।

অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায় – জিকির শেষ হয়।

মুহূর্তে কী যেন লন্ডভন্ড হয়ে যায় – সাংঘাতিক একটা কিছু যেন ঘটে যায়।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ – ক্রুদ্ধ হয়।

মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে – জিকির থেকে মন অন্য দিকে চলে গেছে।

ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে – ভেঙে দিতে বা ছিন্ন করতে এসেছে।

অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তানিয়ে আছে – অসহায় মজিদ যেন রহীমার মধ্যে নির্ভরতা খুঁজছে।

আঞ্চলিক শব্দ

আসছে – এসেছে।

বিটি – বেটি, মেয়েলোক।

ভাগ – চলে যা।

হে কই – সে কোথায়।

চইলা – চলে।

দেখলা – দেখলে।

হ – হ্যাঁ।

লগে – সঙ্গে।

বিয়া – বিয়ে।

দিছিলা – দিয়েছিলে।

কী যে কন – কী যে বলেন।

যানি – যেন।

জীগাই – জিজ্ঞাসা করি।

কী কমু – কি বলব?

মাইয়াডা – মেয়েটা।

মাইয়াডা যানি কেমুন – মেয়েটা যেন কেমন।

ঠিক হইয়া যাইবনি সব – ঠিক হয়ে যাবে সব।

পাঠসংক্ষেপ

সেদিন বাদ মগরেব মাজারে জিকির হয়। এ উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না হয়। বরাবরের মতো রান্নার দায়িত্ব পড়ে রহীমার ওপর। মজিদ আজ বিশেষ সাজে সেজেছে। এক এক করে লোক আসতে থাকে। দোয়া দরুদ দিয়ে জিকির শুরু হয়, তারপর তা আস্তে আস্তে প্রচণ্ড গতি লাভ করে। জিকিরের আওয়াজে জমিলা ভয় পায়। জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকজন তার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে গাছের তলায় জমিলাকে ঘোমটাশূন্য অবস্থায় দেখা যায়। জ্ঞান ফিরে এলে মজিদও তাই দেখে। সে লোকজনের কাছে জমিলাকে কাজের বেটি রূপে পরিচয় দেয়। জিকির শেষে বাড়ির ভিতরে এসে জমিলার বাইরে যাওয়ার জন্য মজিদ রহীমার কাছে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে এ রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য মজিদ অনুতপ্ত হয়। মজিদ অনুভব করে রহীমাই তার ঘরের খুঁটি বা অবলম্বন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন-১: জিকির অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর: একদিন বাদ মগরেব মাজারে জিকির হয়। জিকির উপলক্ষে শিরনি চড়ানো হয়। আগে থেকেই লোকজন চাল-ডাল মশলা ইত্যাদি পাঠিয়েছে। মজিদ সেগুলো ছুঁয়ে দিলে রহীমা রান্না বসায়। অন্দরের উঠানে চুলা কাটা হয়েছে। সেখানে রান্না হয়। মগরেবের পর বাইরের ঘরে লোক আসতে থাকে। সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বিছানার এক পাশে মজিদ বসে। মজিদ আজ আলখাল্লা ও পাগড়ি পরেছে। মজিদের বসার জায়গার দুপাশে দুই মোমবাতি, আর সামনে জ্বলন্ত আগরবাতি। অনেক দোয়া দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে জিকিরের গতি থাকে কম, পরে

সকলের ঘনঘন উচ্চ চিৎকারে জিকির প্রচণ্ড রূপ লাভ করে। এ অবস্থাকে মহা অগ্নিকুণ্ড কিংবা সমুদ্রের ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২: জিকিরের আওয়াজ শুনে জমিলার কী প্রতিক্রিয়া হয়?

উত্তর: খিচুড়ি রান্নার সময় জমিলা ডেকচির ভিতরে দেখে বারবার। এদিকে বাইরে থেকে জিকিরের আওয়াজ আসে। আওয়াজ ঘন ঘন হয়, জোরে জোরে হয়। এতে জমিলা অস্থির হয়ে পড়ে। তার মনে ভয় আসে। জমিলা রহীমাকে ডাকে। রহীমা উত্তর দেয় না এবং ফিরে তাকায় না। এদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো জিকিরের আওয়াজ আসতে থাকে। এতই তীব্র তার গতি যে জমিলা এক সময় হঠাৎ ওঠে দাঁড়ায়। রহীমা কোন কথা না বলাতে অস্থিরচিত্ত জমিলা উঠান পেরিয়ে বাইরে গিয়ে ঘোমটাশূন্য অবস্থায় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন মুসুল্লিরা তাকে দেখে ফেলে। জিকির করতে গিয়ে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান ফিরলে সেও জমিলাকে দেখে। মজিদ জমিলাকে লোকজনের সামনে কাজের বেটি বলতে চায়। মজিদের তাড়া খেয়ে জমিলা ভিতর বাড়িতে চলে যায়।

প্রশ্ন-৩ : জমিলার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রহীমার মনোভাব কী?

উত্তর : জিকিরের কালে ভিতর বাড়ি থেকে বাইরে আসাতে জমিলার ওপর মজিদ বেশ রাগ করে। তবে সে জমিলাকে কিছু বলে না, কিন্তু রহীমাকে অনুযোগ করে। রহীমা স্বামীর চাপা ক্রোধ অনুভব করে। জমিলার বাইর যাওয়ার কথা ভাবতেই তারও মাথা ঝিমঝিম করে। একরকম ভয়ও পায় সে। অল্পবয়সী ক্ষীণকায়া এ মেয়েটি সংসারে ফাটল ধরাবে মনে হয়। জমিলা বিপদ ডেকে আনছে, ফলে মাজারের ছায়ায় যে সংসার গড়ে ওঠেছে তা অচিরে ধ্বংস হবে।

প্রশ্ন ৪ : 'বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলা নি?" উক্তিটিকে কার উদ্দেশ্যে করেছে এবং কেন করেছে?

উত্তর : মজিদ তার প্রথমা স্ত্রী রহীমাকে কথাটি বলেছে। তার ধারণা ছিল জমিলাকে বিয়ে করলে সংসারে আনন্দ ও বৈচিত্র্য বাড়বে। কিন্তু মজিদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। অল্পবয়সী উচ্ছল স্ত্রী জমিলাকে সে একেবারেই বশ করতে পারেনি। মজিদের বয়স এ মাজারের পরিবেশের সঙ্গে জমিলা মোটেও খাপ খাওয়াতে পারেনি। এটি বোঝা গেল জিকিরের সময় ভিতর বাড়ি তেকে জমিলার বাইরে বেরিয়ে আসাতে। মজিদ জমিলার ব্যবহারে খুব ক্রুদ্ধ হয় ও দুঃখ পায়। সে বোঝে জমিলা তার কথামতো চলবে না। এ রকম একটা মেয়েকে সে কেন বিয়ে করল এ অনুতাপে তার মন ভরে যায় এবং এ কথা সে রহীমাকে বলে। রহীমা তার প্রথম স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী থাকতে আরেকটা বিয়ে করাতে রহীমা তাকে বদদোয়া দিয়েছে নিশ্চয়ই। তা না হলে জমিলা এখন অবাধ্য কেন? মজিদের উক্তিতে এটি বোঝা যায় জমিলার ব্যাপারে সে খুব অসহায়।

প্রশ্ন-৫ : 'তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে।' –কে দেখে? নোতুন মজিদ কী রকম?

উত্তর :নতুন এক মজিদকে দেখে তার স্ত্রী রহীমা।

মজিদ হাড়সর্বস্ব ছোট খাট মানুষ হলে কি হবে, সে কিন্তু খুব প্রতাপশালী। মহব্বতনগরে সে হল সবচেয়ে শক্তিমান লোক। তার স্ত্রী রহীমা বিশালদেহী, কিন্তু সে স্বামীকে খুব ভয় করে। স্বামীর প্রতি সে তার আনুগত্য অটুট রেখেছে। এদিকে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা মজিদকে মানতে চায় না। সে ঘোমটা খুলে সকলের সামনে বেরিয়ে আসে, জিকিরের সময় তাই হয়েছে। জমিলাকে বিয়ে করে মজিদ ভুল করেছে কিনা এটিই রহীমার কাছে মজিদের জিজ্ঞাসা। মজিদকে বড় অসহায় মনে হয়। রহীমার ওপর মজিদ নির্ভরতা খুঁজে পায় যেন। খুব কোমল কণ্ঠে পরমাত্মীয়র মতো সে রহীমার কাছে তার দুঃখ প্রকাশ করে। মজিদের এ নতুন রূপ। কখনও মজিদকে সে এমন রূপে পায়নি, এমনভাবে কথা বলতে দেখেনি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কাঙালের মত তাদের দৃষ্টি যেন হাতড়ায়। মহা সমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

২. লতার মত মেয়েটি যেন এ সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে।

৩. এতদিনের সহবাসের ফলেও যে চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে চোখ এ মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে।

বালুতীরে যুগ যুগ আঘাত পাওয়া শক্ত- কঠিন পাথর তো সে নয়।

আলোচ্য লাইনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে জিকিরের সময় জমিলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মাজারে এক সন্ধ্যায় জিকির হয়। এ উপলক্ষে খিচুড়িও রান্না করা হয়। রান্নার দায়িত্বে থাকে মজিদের প্রথম স্ত্রী রহীমা। দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা রহীমার রান্না বান্নার কাজ দেখে। বাইরে থেকে জিকিরের আওয়াজ আসতে থাকে। প্রথমে জিকির চলে আস্তে আস্তে, পরে তা বহু মানুষের সম্মিলিত আওয়াজে প্রচণ্ড গতি পায়। এতে জমিলার মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় জাগে। সে সচকিত হয়ে ওঠে। ঝড়ের সময় সমুদ্রের এক একটা ঢেউ যেমন তীরে আঘাত হানে, ঠিক তেমনি জিকিরের ঘন ঘন ধ্বনি জমিলার হৃদয়কে আঘাত হানে, জমিলার হৃদয় সমুদ্রের তীরের মতো শক্ত নয়। রহীমার মধ্যে বরং কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। জিকির বহুবার সে দেখেছে। কিন্তু জমিলা কখনও জিকির শোনে নি। সে জন্য প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন জিকির জমিলাকে দিশেহারা করে তোলে, সে বিভ্রান্ত হয়ে রহীমার দিকে তাকায়।

প্রশ্ন-২ : তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

উত্তর : আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে মজিদের প্রথম স্ত্রী রহীমার স্বামীভক্তি সম্পর্কে সুন্দর একটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মহববতনগর গ্রামে এসে মজিদ স্থায়ীবাস গড়েছে এবং রহীমাকে বিয়ে করেছে। চওড়াদেহী রহীমা তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু সে শান্তশিষ্ট কর্মনিপুণা এক মহিলা। তাছাড়া স্বামীর মুখের ওপর সে যখন ও কথা বলেনি। রহীমা সেবা যত্ন ও পরিশ্রম দিয়ে সংসারকে আগলে রেখেছে। মজিদের মেজাজ-মর্জি সবই সে ভালো করে বোঝে এবং সেই ভাবে চলে। মজিদ পরে অল্পবয়সী তরুণী জমিলাকে বিয়ে করে। জমিলার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। মজিদ আশা করেছিল জমিলাকে বিয়ে করে সে আরো বেশি আনন্দ পাবে। কিন্তু মজিদ অচিরেই ভুল বুঝতে পারে। জমিলা তার চরম অবাধ্য হয়। এমনকি জিকিরের সময় সে রীতিনীতি উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে চলে আসে। এ রকম মেয়েকে সে কেন বিয়ে করল এ প্রশ্ন জাগে। তখন রহীমার সঙ্গে জমিলার পার্থক্য বোঝা যায়। মজিদ অনুভব করে, রহীমা এমন একটি মেয়ে যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। স্বামীর প্রতি রহীমার ভক্তি বিশ্বাস কখনও টলেনি এবং সব সময় সে স্বামীর প্রতি অনুগত থেকেছে। সে জন্য রহীমাকে মজিদের সবচেয়ে আপন মনে হয়।

ইউনিট ৯

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- জমিলার ওপর ক্রুদ্ধ মজিদের নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন।

মূলপাঠ

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে ওঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছো। খালি তা না, তুমি তানারে নারাজ করছো। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার ওপর তানার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, –আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়ে বাপের বাড়িৎ পাঠাইয়া দিতো। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

–হুনছো নি কী কইলাম?

কোন উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে সে বলে,

–দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছো তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এ কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোন উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

–তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষের কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিলো খেয়াল করেনি। মাজার ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এলো তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেলো। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করলো মাজার ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের

ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেলো ভয়ে। আবার বাইরে গেলো, আবার এলো ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এলো। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এলো তখন আর কোন আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করলো মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজারপাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কোন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছু খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথার কোন উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহীমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে, ওঘরে মজিদ হুকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে ওঠেছে। রহীমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মচেতনতায়।

রহীমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মত শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহীমা, ঘুনধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে-থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে-ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। এক সময়ে রহীমা আস্তে ওঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মত ভাব নাবে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে ওঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীর-ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে—এ অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মত আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু, করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে-পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মত এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে ওঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারি যে, গলা ছেড়ে চীৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

—তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয় ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহীমা পাশের বিছানা থেকে ওঠে এসেছিলো, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদা-তা'য়ালার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহীমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মত কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে ওঠে বসেছিলো, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকালো। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখলো। তাতে হাত বুলালো না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেলো না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললো বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয় নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিলো, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও ওঠেছিলো জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিলো, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাচ্ছিলো, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারলো না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো।

পেছনে-পেছনে রহীমা আসছিলো কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলো না; এও বুঝলো না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মত প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয়, দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহীমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বললো,

—হে আমার মুখে থুথু দিলো!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো রহীমা,

—কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠেছে।

মজিদ রহীমার চীৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোন কথাও বললো না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই। তার হাতের লইট্টা মাছের মত হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোন কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরো কঠিনতর করে তুললো। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো বাইরের দিকে। ভেবেছিলো, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এমন নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মত এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটু আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মত নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মত মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

গোগ্রাসে – বড় বড় গ্রাসে। **বে-ইজ্জত** – অসম্মান। **এৎবার** – প্রসন্নতা, দয়া। **নাজুক** – অপরিণত। **রুক্ষ** – কর্কশ, কঠিন। **নির্বাক** – চুপ। **সংযত** – নিয়ন্তি। **তারাবি নামাজ** – রোজার বিশেষ নামাজ। এশার নামাজের পর পড়তে হয়। **কণ্ঠস্বর** – গলার আওয়াজ। **এশার নামাজ** – রাতের নামাজ। **অজু** – নামাজ কিংবা ধর্মীয় কাজ করার আগে হাত মুখ ধুয়ে পবিত্র হওয়া। **ভয়াবহ** – ভীতিকর, ভয়ানক। **গর্জন** – প্রবল চীৎকার। **রক্ত পানি হওয়া** – অতিরিক্ত ভয় পাওয়া। **পাক** – পবিত্র। **নাপাক** – অপবিত্র। **দরবার** – দরবেশ বা পীরের মাজার। **জায়নামাজ** – নামাজ পড়ার জন্য ছোট সতরঞ্চি বা গালিচা। জায়নামাজে ওঠাবসা করে – নামাজ পড়ে। **হুকায় দম দেয়** – হুকা টানে। **পিটপিট** – বারবার পলক পড়া। **আত্মসচেনতায়** – নিজের উপলব্ধিতে। **স্বতঃপ্রবৃত্ত** – নিজেই উদ্যোগী। **টনটন** – ব্যথা বেদনার অনুভূতির ভাব। **ঘুনধরা হাড়** – বুড়ো হাড়। **সুখ ভোগ** – সুখের উপলব্ধি। তন্দ্রা – হালকা ঘুম। **সেজদা** – আল্লার উদ্দেশ্যে মাথা মেঝেতে ঠেকান। **আচমকা** – হঠাৎ। **কাবু** – বশীভূত। **চিনচিনে** – অল্প অল্প। **উত্তপ্ত** – গরম। **হ্যাঁচকা** – আচমকা। **গোঁগোঁ** – গর্জনের শব্দ। **নিঃসৃত** – বের। **থরথর** – ভয়ে, ক্রোধে বা অন্য কারণে বেশি রকম কাঁপার। দুরন্ত অতিমাত্রায়। **নাখোশ** – অসন্তুষ্ট। **বিদ্যুৎছটা** – বিদ্যুতের চমক। **বেগ পেতে হয় না** – কষ্ট হয় না। **অবসর** – সুযোগ, সময়। **ত্রিসীমানায়** – ধারে কাছে। **তৃণখণ্ড** – খড়কুটো। **ঘনীভূত** – বেশি ঘন হওয়া, বেড়ে খাওয়া। **বেঁকে বসলো** – অসম্মত হল। **শক্তি সংযোগ করে** – শক্তি দিয়ে। **বজ্রমুষ্টি** – হাত দিয়ে ভীষণ শক্তভাবে ধরা। **পিচ** – থুথু বা লালা জাতীয় পদার্থ মুখ থেকে ফেলার আওয়াজ। **নিক্ষেপ** – ছুঁড়ে ফেলা। **ঠাঁয়** – একই জায়গায়। **প্রতিপত্তিশালী** – ক্ষমতাবান। **খোদাভাবমত্ত** – খোদার জন্য পাগল হয়েছে যে মানুষ। **সিক্ত** – ভেজা। **আর্তনাদ** – কাতর চিৎকার। **আরশ** – আল্লাহর আসন। **ফতুয়া** – ছোট গলাকাটা জামা। **লইট্টা মাছ** – সাদা রঙের ছোট আকারের নরম সামুদ্রিক মাছ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুপরিচিত। **পাঁজাকোলা** – দুহাত দিয়ে ধরে কোলে নেয়া। **অপরিণত** – যা পরিণত হয়নি। **অর্ধচক্রাকারে** – অর্ধ বৃত্তের মতো। **ঝলকানি** – হঠাৎ প্রখর আলোর চমক। **নিষ্পেষিত** – পিষ্ট। **দুর্দান্ত** – প্রবল।

বাক্যের বিশিষ্ট অর্থ

রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে – অতিমাত্রায় ভয় পেল।

জায়নামাজে ওঠাবসা করে – নামাজ পড়ে।

মজিদ ঘন-ঘন হুকায় টান মারে আর চোখটা পিট পিট করে আত্মচেতনতায় – মজিদের মনে আনন্দ জাগে।

ঘুন ধরা হাড়ের মধ্যে যে ব্যথার রস টন টন করে তার আরাম করে – বুড়ো হাড় টিপে আরাম দেয়।

রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশ ঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে ঘাটে – রাত বাড়লে প্রকৃতিও ঘুমিয়ে পড়ে।

সে নীরবতার আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই – জমিলার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

দস্যুর মত আচমকা এসেছে সে ঘুম – হঠাৎ ঘুম এসে গেছে।

সে চোখ কালো হয়ে আসে – অসন্তুষ্টির ভাব।

রাতের নীরবতা এত ভারি – গভীর নিস্তব্ধ রাত।

গর্জন করছে খোদাতালার ন্যায়বাণী, তার নাখোশ দিল – মজিদের ভর্ৎসনা যেন মজিদের নয়, আল্লাই যেন তার মুখ দিয়ে উচিত কথাগুলো বলাছে।

বাক্যবাণ নিষ্ফল – কথায় কাজ না হওয়া।

মজিদের টানে স্রোতে ভাসা তৃণখন্ডের মত ভেসে যাচ্ছিল – জমিলা মজিদকে কোন বাধাই দেয়নি।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল – হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

তার বুকের মধ্যে ফুলের মত নিষ্পেষিত করে ফেলবার – মজিদ জমিলাকে নিবিড়ভাবে পেতে চায়।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

তাঁনারে নারাজ করছো – তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছ। মোদাচ্ছের পীরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেওন – দেয়া।

হুনছো নি কী কইলাম – শুনেছ কি বললাম?

পড়বা – পড়বে।

কাইল যে কামটা করছো – গতকাল যে কাজটা করেছ

তানি ঘুমাইয়া নাই – তিনি ঘুমিয়ে নেই। মোদাচ্ছের পীরের কথা বলা হয়েছে।

আইজ রাইতে – আজ রাতে।

ঘুমাইছ – ঘুমিয়েছে।

কী করলা বইন – কি করলে বোন।

পাঠসংক্ষেপ

পরদিন থেকে জমিলার শিক্ষা শুরু হয়। জমিলার ওপর যে সে অসন্তুষ্ট সে কথা সে জানায়। মাজারে যে পীর শুয়ে আছেন তাঁর শাস্তির কথা বলে। একবার বিনা অজুতে মাজারে গিয়ে তার কি হাল হয়েছিল এ রকম একটা বানানো গল্পও সে জমিলাকে শোনায়। মজিদ জমিলাকে তারাবির নামাজ পড়তে ও পীরের কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। সে রাতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে জমিলা জায়নামাজের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে হ্যাঁচকা টানে ঘুম থেকে তুলে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। উপায়ন্তর না দেখে জমিলা মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। মজিদ একেবারে থ মেরে যায়। তারমতো একজন শক্তিশালী মানুষের বিরুদ্ধে কেউ এমন প্রতিবাদ করতে পারে তা মজিদ কোনদিন ভাবেনি। রহীমা আর্তনাদ করে। থুথু মুছে মজিদ জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজারে নিয়ে আসে। এবার জমিলা আর প্রতিবাদ করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন-১ :জমিলার শিক্ষা শুরু হওয়ার সময় মজিদ জমিলাকে কী বলে?

উত্তর : জমিলার প্রতিবাদী আচরণে মজিদ অসন্তুষ্ট হয়। সে মনে করে জমিলার যথোচিত শিক্ষা লাভ ঘটে নি। সে জন্য সে জমিলার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। জমিলাকে সে গম্ভীর কণ্ঠে জানায় যে, গতকাল জমিলা তাকে অসম্মান করেছে। শুধু অসম্মান করেনি, মাজারের বিদেহী পীরকেও সে অসন্তুষ্ট করেছে। এতে মজিদ মনে করছে তার ক্ষতি হবে। জমিলার আচরণের জন্য মজিদ তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু মজিদের দয়ার শরীর। সে ভেবে দেখেছে, জমিলার শিক্ষা হয়নি, তাকে এখন শিক্ষা দিতে হবে। জমিলা তার স্ত্রী হলে কি হবে, সে এখনো অবুঝ।

প্রশ্ন-২ :'তিনি সব জানেন, সব দেখেন।' –এ কথা কে কার উদ্দেশ্যে বলেছে কেন বলেছে?

উত্তর : এ কথাটি মজিদের। মজিদ জমিলার উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলেছে। মজিদের অবাধ্য স্ত্রী জমিলার মনে ডর-ভয় সৃষ্টি করার জন্য মজিদ এ কথাটি বলেছে। পীর ফকির সম্বন্ধে গ্রামের মুসলমান সমাজে ভয় মেশানো ভক্তি রয়েছে। এদের কাছে পীর যেন আল্লাহর প্রতিনিধি। পীরের দোয়া না থাকলে যেন মানুষের মুক্তি নেই। সে জন্য পীরের কবরও মানুষের কাছে বিশেষ মর্যাদা পায়। মজিদ জমিলার কাছে মোদাচ্ছের পীরের শক্তির কথা বলে। এ পীর মরে গেছে বটে, কিন্তু এ হল জিন্দাপীর। কবরে শুয়েও এ পীর সবকিছু দেখেন। এখন জমিলা যদি নামাজ না পড়ে এবং স্বামীকে ভক্তি না করে তাহলে পীরের রাগ তার ওপর পড়বে। সে জন্য জমিলার উচিত নামাজ পড়া এবং পীরের কাছে মাফ চাওয়া।

প্রশ্ন-৩ : মজিদ জমিলার কাছে মাজার সম্পর্কে যে মিথ্যে গল্পটি বলে তা আপনি বর্ণনা করুন।

উত্তর : মজিদ একদিন রাতে এশার নামাজের পরে মাজার ঘরে যায়। তার যে অজু ভেঙে গিয়েছিল তা সে খেয়াল করে নি। মাজারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে শোনে শত সহস্র সিংহের ভয়ানক গর্জন। ভয় পেয়ে সে মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়; তখন আর ঐ গর্জন নেই। আবার সে মাজার ঘরে প্রবেশ করে। তখন আবারও সে রক্ত পানি করা গর্জন। বাইরে এলে দেখা যায় গর্জন থাকে না। হঠাৎ মজিদের খেয়াল হল যে তার অজু নেই। অপবিত্র শরীরে মাজারে ঢুকেছে বলেই ঐ সিংহ-গর্জন। সত্যি সত্যি তাই, অজু করে পাক সাফ হয়ে আসার পর দেখা গেল ঐ রকম কোন আওয়াজ নেই। অজান্তে কোন গুণাহ করে থাকলে আল্লাহ যেন মাফ করেন এ কারণে মজিদ অনেক কান্নাকাটি করে।

প্রশ্ন-৪ : মজিদের মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে কেন?

উত্তর : মজিদ দেখে তার মিথ্যে গল্পের একটা ফল হয়েছে। জমিলার চোখে ভীতির ছায়া দেখা যায়। মজিদ তখন ধারণা করে তার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। মজিদ আরো তৃপ্ত হয় যখন সে দেখে জমিলা অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়ে। রহীমা ঘরের কাজ শেষ করে আসার পরও দেখা যায় জমিলা নামাজ পড়ছে। এতে মজিদ বেজায় খুশি হয়।

প্রশ্ন-৫ : মজিদ জমিলাকে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় কেন? তারপর সে কি করে?

উত্তর : রাত গভীর হলে মজিদ দেখে জমিলা জায়নামাজে সেজদা দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এতে মজিদের ধারণা হয় জমিলার মনে খোদার ভয় নেই, থাকলে এভাবে সে ঘুমাত না। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে এক হ্যাঁচকা টানে জায়নামাজ থেকে ওঠে বসায়। তারপর সে জমিলাকে ভৎর্সনা করে। এতেও জমিলার কোন অনুতাপ না দেখে আরেক হ্যাঁচকা টান দিয়ে সে জমিলাকে দাঁড় করায়। তারপর শক্তভাবে তার হাত ধরে সে জমিলাকে মাজারের দিকে নিতে থাকে।

প্রশ্ন-৬ : জমিলা বেঁকে বসে কেন? সে কি করে?

উত্তর : জমিলা প্রথমে বোঝে নি যে তাকে মাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে যখন বুঝল তখন সে বেঁকে বসে। এর কারণ মাজার সম্পর্কে তার ভীতি। প্রথমত সে, মাজারের ত্রিসীমানায় কখনো ঘেঁষেনি; দ্বিতীয়ত, মজিদ আজ যে গল্প বলেছে তাতে ভয় আরও বেড়ে গেছে। সে জন্য সে মজিদের শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চায়।

কিন্তু ছাড়াতে যখন সে ব্যর্থ হয় তখন সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। হঠাৎ সে পিচ করে মজিদের মুখে থুথু ফেলে।

প্রশ্ন-৭ : মুখে থুথু ফেলার পর মজিদ কি করে?

উত্তর : মজিদ প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়। মহব্বত নগরের সবাই তাকে মান্যগণ্য করে। সেখানে তার নিজের স্ত্রীর হাতে মজিদের এ দশা! মজিদ ভারি অপমান বোধ করে। সে ফতুয়ার নিচের অংশ দিয়ে থুথু মোছে। ততক্ষণে মজিদের হাতের মধ্যে জমিলার হাত ঢিলে হয়ে গেছে। অর্থাৎ জমিলার মধ্যে আর বিরোধিতা নেই। কিন্তু মজিদ সব সময় সতর্ক থাকে। কারণ জমিলাকে তার বিশ্বাস নেই। তারপর সে জমিলাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে মাজারের দিকে আসে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কিন্তু সে ক্ষুদ্র লতার মত মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল।

২. এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ব্যাখ্যেয় অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। মজিদের মুখে থুথু ফেলার পর মজিদ যখন জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনকার জমিলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে।

জমিলা মজিদের কথামতো এক সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে শুরু করে। কিন্তু নামাজ পড়তে গিয়ে জমিলা জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ভীষণ রাগ করে মজিদ জমিলাকে টেনে হিঁচড়ে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মাজারে যেতে জমিলার দারুণ ভয়। মজিদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে সে মজিদের মুখের ওপর থুথু নিক্ষেপ করে। মজিদ হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরে থুথু মুছে সে জমিলাকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে মাজারের দিকে যেতে থাকে। এবার দেখা যায় জমিলা কোন প্রতিবাদ করছে না কিংবা হাত ছাড়াতেও চাইছে না। সে নিস্তেজ হয়ে থাকে। মজিদের ইচ্ছে হয় তার লইট্টা মাছের মতো নরম দেহকে সম্পূর্ণ পিষে ফেলতে। কিন্তু মজিদ খুব সতর্ক থাকে। এ প্রতিবাদী মেয়েটিকে তার বড় ভয়। কখন সে কী করে বসবে তা ঠাহর করার উপায় নেই। মজিদ জমিলাকে বিষাক্ত সাপের সঙ্গে তুলনা করে। এখন চুপচাপ থাকলেও যে কোন মুহূর্তে জমিলা ফণা তুলতে পারে। সুতরাং তার নিস্তেজ ভাব দেখে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- জমিলাকে একাকী মাজার ঘরে আটকে রাখার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি্মান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটু ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারেই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষীপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মত বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মত একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে এমনি সময়ে বুক ফাটা কণ্ঠে মজিদ হা-হা করে উঠলো। তার দুঃখের তীক্ষ্ণ তার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিলো। সভয়ে চমকে ওঠে জমিলা, তাকালো স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মত ঘূর্ণমান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠলো। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নাবা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা ওঠে দাঁড়ালো। কিন্তু মজিদও ক্ষীপ্রভাবে ওঠে দাঁড়ালো। জমিলা দেখলো পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এ সময় সে বলে,

–দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা ভূতপ্রেতও রক্ষা পায় নাই। এ দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশেমানির ভাব জাগলো না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মত অসহ্য লাগতাছে?

এ বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধলো। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখলো, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

–তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এ সব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিলো, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলোও না, কিছু বললোও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মত বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বললো,

–ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেলো।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

–হে কই?

–মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব সে-জিন।

–ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

–কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠলো মজিদের। দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বললে,

–তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

শব্দার্থ ও টীকা

ধপাস – কোন ভারী জিনিস মেঝেতে রাখার কিংবা ফেলার আওয়াজ। **পাদপ্রান্তে** – পায়ের কাছে, কবরের এক পাশে। **ম্লান** – ফিলে। **রেখায়িত** – চিহ্নিত। **কুপি-লণ্ঠন** – বাতি। **চকমকির পাথর** – এক ধরনের পাথর যা ঘষলে আগুন বের হয়। **আর্তনাদ** – কাতর চিৎকার। **ব্যাকুলতা** – আগ্রহ। **ক্ষীপ্রতায়** – দ্রুততায়। **দুরন্ত** – প্রবল। **মরণভীতি** – মৃত্যুর ভয়। **সর্বনাশা** – ধ্বংসকারী। **স্তব্ধ** – চুপ, নীরব। **ঘনবর্ণ** – কালো রঙের। **স্তূপ** – ঢিবি। ধার – তীক্ষ্ণ তা। **চিড়চিড়** – কোন বস্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু কেটে যাওয়ার ভাব। **ক্ষুদ্র পল্লব** – ছোট পাতা। **ঘূর্ণমান** – যা ঘুরছে। **উদ্‌ভ্রান্ত** – পাগলাটে, এলোমেলো। **ভরসা** – নিশ্চয়তা। **ধাঁ** – দ্রুত যাওয়া বা ওঠার ভাব। **উদ্দামতা** – প্রবলতা। **যো** – উপায়। **তারাময়** – তারায় তারায় পূর্ণ। **দুষ্ট আত্মা** – ভুত প্রেত ইত্যাদি। **জিন-পরী** – কল্পিত অশরীরী প্রাণী। **আছর** – প্রভাব। **পাশেমানি** – দুঃখ বা অনুতাপ। ঢিলা – শিথিল। **চাবকাইতে** – চাবুক দিয়ে মারতে। **নাছোড়বান্দা** – একগুঁয়ে। **শয়তানি** – বদমায়েসি। **তারস্বরে** – উচ্চস্বরে। **পানে** – দিকে। **সন্ধানী** – কৌতুহলী। **ঝাপটা, ঝাপ** – বাঁশের বা বেতের তৈরি দরজা। **অস্ফুট** – অস্পষ্ট। **কড়মড়** – দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণের ভাব। **দম খিচে** – নিঃশ্বাস বন্ধ করে। **ক্রোধ সংবরণ** – রাগ দমন। **জিন** – মুসলমানদের মতে আগুনে তৈরি অশরীরী জীব।

বিশিষ্টার্থক বাব্যাংশ

অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন – অন্ধকারের জন্য কিছুই দেখতে পারছে না।

হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে – মজিদ এমন সুরে দোয়া দরুদ পাঠ করে যে মনে হয় ঝড় ওঠেছে।

মাছের পিঠের মত একটা ঘনবর্ণ স্তূপ – এখানে মাজার সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

হো হো করে উঠল – আর্তনাদ করে উঠল।

দুঃখের তীক্ষ্ণ তার সে কী ধার – বেশি রকম দুঃখ।

অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দুফাঁক করে দিল – কাপড়কে তেমন চিড়াচিড় করে দুই ফাঁক করা যায়, তেমনি দুঃখের আঘাতে অন্ধকারেও দুফাঁক হয়ে গেল। এটি অনুভূতিজ্ঞাপক বাক্য।

ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্র পল্লবের মত ঘুর্ণমান তার অশান্ত উদভ্রান্ত চোখ – ছোট পাতা যেমন ঝড়ে ঘুরতে থাকে, তেমনি চোখটা দিশেহারা।

একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে – ভয়ের জন্য তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

ঝড়ের শেষ নেই – দোয়া দরুদের শেষ নেই।

যে ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার জো নেই, সে ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে – মজিদ দোয়া দরুদ রেখে জমিলার সামনে দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করেছে।

দাঁত কড়মড় করে উঠলো – ক্রোধ প্রকাশ করল।

আঞ্চলিক শব্দ

বইসাও – বসেও, **আইল না** – এলো না, **লাগতাছে** – লাগছে, **করুম না** – করব না, **পহর** – প্রহর, **ছাড়ি** – ছেড়ে, **পলাইব** – পালাবে, **দেখবা** – দেখবে, **আইছে** – এসেছে, **কইরা** – করে, **থাইক না** – থেক না, **দিছে** – দিয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ

মজিদ জোর করে অন্ধকার মাজার ঘরে জমিলাকে নিয়ে আসে। জমিলাও চোখে অন্ধকার দেখে। মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে থাকে তীব্র কণ্ঠে। সামনে মাছের পিঠের মতো কবর। মজিদের কণ্ঠের হাহুতাশে জমিলা ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। সে একবার মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজিদ পথ বন্ধ করে রাখে। তারপর দোয়াদরুদ শেষে

মজিদ জমিলাকে বলে, সে যেভাবে বলবে জমিলা যেন সেভাবে কাজ করে। তারপর সে জমিলাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তাকে বলে এক রাত মাজারপাকের কাছে থাকলে দুষ্ট আত্মা বাপ বাপ করে পালাবে এবং এভাবে জমিলার মনে খোদাভীতি ও স্বামীভক্তি আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্ন-১ : মজিদ জমিলাকে কোথায় নিয়ে আসে? সেখানকার পরিবেশ কেমন? জমিলার তখন কী অবস্থা হয়?

উত্তর : মজিদ জমিলাকে পাঁজাকোলা করে সোজা মাজার ঘরে নিয়ে আসে। মাজার ঘর অন্ধকার। এখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। মৃত্যুর ভীতিতে আঁধার করা এক পরিবেশ এ মাজারের।

জমিলা ভয় পেয়ে যায়। ভয়ে অসাড় হয়। সে যেন চোখে কিছু দেখে না। চারদিকে চোখ হাতড়ায়। আলো দেখবার একটা তীব্র ব্যাকুলতা তার মধ্যে জাগে। কিন্তু অন্ধকারের পর্দা আরো গাঢ় হয়।

প্রশ্ন-২ : মজিদ জমিলাকে কি বলে?

উত্তর : দোয়া দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ জমিলাকে বলে, সে যেভাবে বলবে জমিলাও যেন সেভাবে কাজ করে। দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মজিদকে মানে, এমন কি জীন পরীরাও তাকে ভয় করে, কিন্তু জমিলা তার অবাধ্য। মনে হয় তার ওপর কিছুর আছর হয়েছে। মজিদ জমিলাকে এও জানায় যে, তার জন্য মায়া হয়। জমিলাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তারও মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মজিদ নিরুপায়। তবে মজিদ জিনের আছর ছাড়ানোর জন্য জমিলাকে বিশেষ কষ্ট দিতে চায় না। শুধু এক রাতের জন্য তাকে মাজারে বেঁধে রাখবে। তাহলে জমিলা দুষ্ট আত্মা থেকে মুক্ত হবে এবং আগামী কালই দেখা যাবে জমিলার মনে খোদার ভয় ও স্বামীভক্তি এসে গেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এটুকুন পথ পেরোবার উপায় নেই।

এ অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'লালসালু' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। এ অংশে মাজার ঘরে আটকে পড়া জমিলার মনের অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপের কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে জোর করে মাজার ঘরে নিয়ে আসে। মাজারে গভীর অন্ধকার। এ পরিবেশে জমিলা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। এর মধ্যে মজিদ এমন এক দুঃখের ভঙ্গিতে দোয়া দরুদ পড়তে থাকে যে জমিলার ভয় আরো বেড়ে যায়। তখন জমিলা আর্তনাদ করে ওঠে। পরে মাজার থেকে সে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মজিদ তাড়াতাড়ি ওঠে পথ আগলে রাখে। সামনেই উন্মুক্ত দরজা, তারপর অন্ধকারে তারাময় আকাশ। অবাধ মুক্ত এলাকা পড়ে আছে সম্মুখে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার উপায়। মজিদের সতর্ক পাহারার কারণে জমিলার পক্ষে মাজার ঘরের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মাজার ঘরে বন্দী দশায় রাত কাটানো জমিলার পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রহীমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইলো তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করলো না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইলো। যে-কোন মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে—এ আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুললো। কিন্তু ওধারে কোন আওয়াজ নেই। থেকে-থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীর্ঘগাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মত অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে-থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোন আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মত তারও নড়চড় নাই।

আরো সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে ওঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝির-ঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মত সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে-সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহীমা একবার ছায়ার মত এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোন তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোন প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে-অপেক্ষা যুগযুগব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোন উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে-বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎচমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মত মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে অন্ধকারের তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়তো-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মত সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন কারণ, দ্রুর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মত গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মত সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মত প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে ওঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদ সঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎ বেগে মজিদ ওঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহীমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো। সে কোন উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

–বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে।

রহীমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সে-দিনকার চোখের মত হয়ে ওঠেছে–যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিলো।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মত খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটতো, এক আধটা হয়তো আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়তো, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসতো বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটতো বাইরে, লুফে-লুফে খেতো খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে–তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মত আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহীমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মত উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহীমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

–কী হইল তোমার? দেখ না শিলাবৃষ্টি পড়ে।

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহীমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহীমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

–কী হইলো তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

–ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটু ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মত সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমন কী তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহীমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এ রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোন উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

—না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এ রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহীমা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে ওঠে হঠাৎ বন্যার মত দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্প্রমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে ওঠে বলে—সব তো গেলো। এবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মত শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

—নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

শব্দার্থ ও টীকা

সন্ধান – খোঁজ, **স্তব্ধতা** – নীরবতা। **দাওয়া** – ঘরের মেঝের বাড়তি অংশ, বারান্দা। **শ্বসন** – নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। **নিঃশব্দপ্রায়** – নীরব। **পাক খেয়ে যাচ্ছে** – ঘুরে ঘুরে উড়ছে। **গুমোট** – হাওয়া-বাতাসহীন অবস্থা, ভ্যাপসা গরম। **মুমূর্ষু** – মরণাপন্ন। **সুহৃদ** – বন্ধু। **নিশ্চল** – স্থির। **ঘনীভূত** – যা ঘন হয়েছে। **মেঘস্তূপ** – মেঘের পুঞ্জ। আড়মোড়া ভেঙে – আলস্য ত্যাগ করে। **পালক স্পর্শ** – আলতো নরম স্পর্শ। **সারা** – শেষ, অবসান। **নিরলস দৃষ্টি** – সচেতন দৃষ্টি। **তাগিদ** – প্রেরণা। **উদ্বেগ** – চিন্তা। **ঝলসে ওঠা** – প্রখর আলোসহ প্রকাশ পাওয়া। **উদ্ভাসিত** – আলোকিত। **উলঙ্গ** – নাঙ্গা। **গোমড়া** – ব্যাজার। **অবসর** – বিশ্রাম। **উপভোগী** – যে ভোগ করে। **কুদরত** – মহিমা। **লীলা** – গূঢ় কাজ। **আসন্ন** – আগত প্রায়। **এবাদত** – উপাসনা। **থমথম** – বিপদ সূচক ভাব। **থিয়েটার** – নাট্যশালা। **যবনিকা** – পর্দা। **কাটি-কাটি** – শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে এ রকম ভাব। **আভা** – আলোর ছটা। **প্রকৃতি অবলোকন** – প্রকৃতিকে দেখা। **ঝাপটায়** – আঘাতে, ধাক্কায়। গোঙায় – কাঁদে। **সুবেহ সাদেক** – সূর্য ওঠার আগে প্রভাতের রূপ, প্রথম ভোর। **নির্মল** – পরিষ্কার। **পাচ পদের ছুরা আল কালাম** – পবিত্র কোরানের বিশেষ ছুরা। এ ছুরাতে পাঁচটি পদ বা লাইন আছে। **মায়াজাল** – ছলনা। **বাহ্যিক** – বাইরের। **ফলা** – তীরের তীক্ষ্ণ মুখ। **পথ ভ্রষ্ট** – পথ হারিয়েছে যা। **উল্কা** – হাউই। **বিপদ সঙ্কেত** – বিপদের আভাস। **অজস্র** – অনেক। **তড়িৎবেগে** – বিদ্যুতের গতিতে। **উৎকণ্ঠিত** – চিন্তিত। **আবছা** – অস্পষ্ট। **হয়রান** – ক্লান্ত। **লুফে লুফে** – ধরে নিয়ে। **নধর-কচি** – অতি কচি। **শিষ** – ধান গাছের আগা। **পায়চারি** – হাঁটা। **পোষা জীবজন্তু**– গরু ছাগল ইত্যাদি। **আফসোস** – দুঃখ। জান – জীবন, প্রাণ। **গুঁড়িগুঁড়ি** – ক্ষুদ্র বিন্দু। **মেঘাবৃত** – মেঘে ছাওয়া। **ভেদ** – ছেদ। **ধুসর** – ছাই রংয়ের। **বোজা** – বন্ধ। **স্থানান্তরিত** – পরিবর্তন। হুঙ্কার – গর্জন। **ঘোর** – আচ্ছন্নতা। **দুর্বার** – যা বারণ করা কষ্টকর। **কম্প্রমান** – যা কাঁপছে। **বিমূঢ়** – হতবুদ্ধি। **কেয়ামত** – প্রলয়, মুসলমান মতে যেদিন সৃষ্টি ধ্বংস হবে। **উচ্ছ্বাস** – ভাবাবেগ। **মুহূর্ত** – ক্ষণ, সামান্য সময়। **ওলট-পালট** – এলোমেলো।

উপক্রম – আয়োজন। **আদিগন্ত** – দিগন্ত পর্যন্ত। **টান খেয়ে** – ঘুরে। **পরীক্ষাক্ষেত্র** – পরীক্ষার জায়গা। **আঁধা** – অন্ধ। **বিনিদ্র** – ঘুমহীন। **প্রান্তে** – একদিকে। **হাহাকার** – আর্তনাদ। **পোলাপান** – ছেলেপিলে। **নাফরমানি** – অবাধ্যতা। **তোয়াক্কল** – বিশ্বাস, নির্ভরতা। **ব্যাপ্ত** – ছড়ানো। **খোদাই** – ক্ষোদিত, পাথরে কেটে অঙ্কিত।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

কান খাড়া হয়ে ওঠা – কিছু শোনার অপেক্ষা

ছায়ার মত এসে ঘুরে যায় – নিঃশব্দে এসে দেখে যায়

সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায় – বিদ্যুতের আলোতে সব আলোকিত হয়ে যায়

চিরে দুফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ – অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে মনে হয় তা আকাশকে চিরে দুফাঁক করছে।

আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে – বিপজ্জনক কিছু ঘটবে এমন একটা ভাব।

রাতও কাটি কাটি করে কাটে না, রাত্রির যবনিকা ওঠে না – রাত শেষ হয় না।

ভ্রূর কাছটা একটু কুঁচকে যায় – বিরক্তির প্রকাশ।

দিনাদির অধিকারী – আল্লাহ।

তীক্ষ্ণ ফলার মত সে বৃষ্টি – গতিবেগ সম্পন্ন ঝড়ো বৃষ্টি।

কান তার খাড়া হয়ে ওঠে – সে সতর্ক হয়ে যায়।

মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে – ভয়ের বা বিপদের ছায়া পড়েছে মুখে, নিরানন্দ মুখ।

খোদার ঢিল – শিলাবৃষ্টি, শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিরূপী শিলা।

পাথর হয়ে বসে থাকে – বিপদে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

আফসোস করে বাঁচে না – অতিরিক্ত দুঃখ প্রকাশ করে।

মজিদের আড়ালে চলে যায় – মজিদের কথা শুনতে চায় না।

গা ঝাড়া দিয়ে – নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করে।

আকাশ এ মাথা থেকে সে মাথা – সবটা আকাশ।

সে বুকটা বালকের বুকের মত সমান – মসৃণ সমান বুক।

মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না – রাগের কোন প্রকাশ ঘটে না।

সে কথার কান না দিয়ে – সে কথা না শুনে।

ঘন ঘন হাত বুলাতে শুরু করে – আদর করতে থাকে।

বন্যার মত দুর্বার হয়ে ওঠে – অতিরিক্ত মায়া জাগে।

ওলট পালট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় – পরিবর্তন জাগে।

জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ণা অনুভব করে – সত্যকে তীব্রভাবে অনুভব করে।

সব তো গেলো – সর্বনাশ হল।

বিবর্ণ কাঠের মত শক্ত দেখায় – অসুন্দর কঠিন মুখ।

বিশ্বাসের পাথরে খোদাই সে চোখ – চোখে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের রূপ।

পাঠসংক্ষেপ

জমিলাকে মাজার ঘরে আটকে রেখে মজিদ ঘরের ভিতরের দাওয়ায় বসে থাকে। তার ধারণা ছিল জমিলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ একটু পরে শোনা যাবে। কিন্তু সে রকম কোন আওয়াজ আসে না। আরো পরে আকাশে মেঘ জমে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, শীতল হাওয়া বয়ে যায়, ঝড় আসে তীব্র গতিতে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। ঝড়ের পরে নামে জোরালো শিলাবৃষ্টি। রহীমা আর মজিদের কথা শোনে না, জমিলাকে নিয়ে আসতে বলে। শিলাবৃষ্টি থামলে মজিদ মাজারের ঝাপটা খোলে। জমিলা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে সালুতে ঢাকা কবরের পাশে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। দড়ি খুলে মজিদ তাকে ভিতরে নিয়ে আসে। রহীমা পরম আবেগে জমিলার গায়ে হাত বুলাতে থাকে। মজিদের মধ্যেও ভাবাবেগ জাগে। কিন্তু মজিদ নিজেকে সামলে নেয়। বলে, দুনিয়াটা একটা পরীক্ষা মাত্র। এরপর মজিদ মাঠের দিকে যায়। সে হাহাকাররত লোকজনদের নাফরমানি না করে খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে বলে। তার নিজের চোখেরও রয়েছে অটল স্থায়ী বিশ্বাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞ নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন-১ :জমিলাকে মাজারে আটকে রাখার রাতে প্রকৃতির পরিবশে যে রকম ছিল তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : রাতটি ছিল ভয়াবহ। থেকে থেকে প্যাঁচা ডেকে উঠছিল, শকুনের বাচ্চার অবিশ্রান্ত কান্না শোনা যাচ্ছিল, একটা বাদুড় এদিক ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর শোনা গেল মেঘের গম্ভীর গর্জন। আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত। থেকে থেকে বিজলি চমকাচ্ছিল, দক্ষিণ পশ্চিম কোন থেকে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসছিল। তারপর নামল প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ে বিদ্যুতে, বৃষ্টিতে তখন প্রকৃতির ভয়ঙ্কর অবস্থা। শেষে নামল তুমুল শিলাবৃষ্টি। জমিলাকে মাজারে আটকে রাখার প্রকৃতির পরিবেশ এ রকম অশুভ ছিল।

প্রশ্ন-২ :ছুরা আল ফালাকের মুল কথা কি?

উত্তর : দিনের আলোকে যে কুৎসিত অন্ধকার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সেই অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। হে দিনের প্রভু, আমি বাঁচতে চাই অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে, আর যত দুর্বলতা থেকে।

প্রশ্ন-৩ :'ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?" এটি কার উক্তি? এটি কেন করা হয়েছে? এ উক্তির তাৎপর্য কী?

উত্তর : এটি রহীমার উক্তি।

জমিলাকে একটি ভয়াবহ ঝড়ের রাতে মাজারে একলা আটকে রাখার কারণে জমিলার জীবনাশঙ্কায় এ কথা বলা হয়েছে।

মানুষের জীবন সব চাইতে মূল্যবান। জীবন না থাকলে মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ কথাটি সবার আগে বুঝতে হবে। মুখে থু থু নিক্ষেপ করেছে বলে অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে রাতের বেলায় মাজার ঘরে দড়ি বেঁধে সম্পর্ণ একাকী অবস্থায় রাখে। এমনিতে কবরে একাকী থাকা অতি ভয়ের, তদুপরি ঐ রাতটি ছিল ঝড় বিদ্যুৎ শিলাবৃষ্টিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর। শিলাবৃষ্টিতে ধান সম্পর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম শিলাবৃষ্টি হলে রহীমা বড়

আফসোস করতো। কিন্তু এবার রহীমার উদ্বেগ জমিলার জন্য। মজিদ যেভাবে জমিলাকে বেঁধে রেখেছে তা অত্যন্ত অমানবিক। জমিলা মরেও যেতে পারে। এ প্রথম রহীমা মজিদের অবাধ্য হয়। রহীমা মজিদকে বুঝিয়ে দেয় যে, ধানের চেয়ে মানুষের জানের দাম অনেক অনেক বেশি।

প্রশ্ন-৪ : মাজারে ঝাপটা খুলে মজিদ জমিলাকে কোন অবস্থায় পায়?

উত্তর : সারা রাত ধরে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি থামলে রহীমার কথা মতো জমিলাকে আনতে যায় মজিদ। মাজারের ঝাপটা খুলে মজিদ দেখে জমিলা সালু কাপড়ে ঢাকা কবরের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। আর মেহেদি দেয়া একটি পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। জমিলা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন।

প্রশ্ন-৫ : ‘দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া মায়া সকলের আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।” –কথাটি কার? কার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে এবং কেন?

উত্তর : উপরের কথাটি মজিদের। মজিদ তার স্ত্রী রহীমাকে কথাটি বলেছে। মজিদ জমিলার ওপর জীন-পরীর আছর ছাড়ানোর জন্য জমিলাকে রাতের বেলায় মাজারে বেঁধে রেখেছে। ঝড়জলের ভয়ঙ্কর রাত শেষ হলে দেখা যায় জমিলা অজ্ঞান অবস্থায় চিৎ হয়ে কবরের পাশে। তাকে ভিতর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রহীমা পরম আবেগে তার সেবা করে। এ সব দেখে মজিদেরও ভাবান্তর হয়। কিন্তু মজিদ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। রহীমাকে সে বোঝায়, দুনিয়াটা হল কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। মানুষের দয়ামায়া অবশ্যই আছে। কিন্তু মানুষ কর্তব্য করবে। সত্য যা তা মানবে। দয়া-মায়া করতে গেলে এ সব হয় না। কর্তব্যে মানুষকে কঠোর হতে হয়। সে জন্য মজিদ রহীমাকে দয়ামায়া দ্বারা আচ্ছন্ন না হতে বলছে।

প্রশ্ন-৬ : ‘নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।” - এ কথা কে কাকে বলেছে এবং কেন বলেছে?

উত্তর : এ কথাটি মজিদ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছে।

আগের রাতে তুমুল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে, ধান গাছের কচি শিষগুলো ঝরে ঝরে পড়েছে। ঝড়ের শেষে মজিদ সকালবেলায় মাঠ দেখতে গেছে। তখন অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। কারো মুখে কথা ছিল না। মজিদকে দেখে সবাই মিলে হাহাকার করে ওঠে। তাদের একটিই কথা; সব তো গেল এখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে খাবে কি! এ অবস্থায় মজিদ সবাইকে আশ্বাস দেয়। আল্লাহর ওপর স্থির বিশ্বাস রাখতে বলে। কেননা আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাদের খাদ্যেরও জোগান দেন। আল্লাহ ছাড়া মানুষের গতি নেই। সে জন্য মানুষের উচিত আল্লাহকে স্মরণ করা। মজিদ আল্লাহ বিশ্বাসের কথা বলে মানুষকে উদ্দীপ্ত ও ধর্মভাবাপন্ন করে রাখতে চায়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. প্রকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও এক রকম এবাদত।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ উপন্যাসের অন্তর্গত। এখানে প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখে আল্লাহর মহিমা উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে।

যে রাতে অবাধ্য জমিলাকে মজিদ জোর করে মাজারে বেঁধে রাখে, সে রাত ছিল অতি ভয়াবহ। মাজার ঘরে ছিল ভৌতিক পরিবেশ, আর বাইরের প্রকৃতিতে আসন্ন বিপদের অবস্থা। মেঘের গর্জন বিদ্যুতের চমকানি, ঝড়, বৃষ্টি সব মিলিয়ে এক ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মজিদ ঘুমায় না। জমিলার আর্তনাদ শুনবে এ রকম ধারণা সে করেছিল। কিন্তু ওখান থেকে কোন শব্দ আসে না। এদিকে বিদ্যুতের চমকানিতে সমস্ত আকাশ যেন দুফাঁক হয়ে যায়। মজিদ চেয়ে

চেয়ে দেখে এবং আল্লাহর মহিমা উপলব্ধি করে। আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতির বৈচিত্র্যের শেষ নেই। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি বদলায়। কখনো কখনো ভয়াবহ রূপও ধারণ করে। প্রকৃতির এ রকম অবস্থাও আল্লাহর কুদরতের অংশ। প্রকৃতিকে যারা এভাবে দেখে তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর এবাদত করে। শুধু নামাজ পড়া এবাদত নয়। এবাদতেরও নানা রকমফের আছে। মানুষকে বুঝতে হবে যে আল্লাহর মহিমা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সে জন্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুধাবন করাও আল্লাহর এবাদত।

২। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।

এটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের সর্বশেষ লাইন। এ অংশে গভীর আল্লাহ বিশ্বাসী মজিদের কথা বলা হয়েছে।

রাতের বেলায় প্রচণ্ড ঝড়ে ও শিলাবৃষ্টিতে ধানের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কচি ধানের শিষগুলো শিলার আঘাতে খসে পড়েছে। সকাল বেলায় গ্রামের কৃষকেরা এসব দেখে ভয়ানক মুষড়ে পড়ে। মজিদ মাঠ দেখতে এলে সবাই হাহুতাশ করে। মজিদ তাদের সান্ত্বনা দেয় এ বলে যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহর উপরে অবিশ্বাস করা চলবে না। কারণ আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের খাওয়া পরার জোগান দিবেন তিনি। মানুষের দিন একরকম যায় না। আজকের ধ্বংস দেখে ভেঙে পড়লে চলবে না। আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে তাহলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। মজিদ ধর্মপথের মানুষ। সে মহব্বত নগরের মানুষদের ধর্মের পথে এসেছে। তার চোখে অন্য কোন ভাব নেই। আল্লাহর বিশ্বাসে সে চোখ খোদাই হয়ে আছে। আজকেও সে ধর্মের কথা, আল্লাহ বিশ্বাসের কথা বলছে।

নিজে করুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. না ঘুমিয়ে মজিদ দাওয়ার ওপর বসে থাকে কেন?
২. আগে শিলাবৃষ্টি হলে লোকজন কী কী করতো?
৩. রহীমা মজিদের কথায় কোন সাড়া দেয় না কেন?

ব্যাখ্যা

১. মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।
২. আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. উপন্যাস বলতে কী বোঝায়? উপন্যাসে কী কী উপাদান থাকা প্রয়োজন, উল্লেখ করুন।
২. 'লালসালু' কোন শ্রেণীর উপন্যাস? আলোচনা করুন।
৩. 'লালসালু' উপন্যাসের সমাজচিত্রের বর্ণনা দিন।
৪. 'লালসালু' উপন্যাসে একটি দ্বন্দ্ব আছে। সে দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি কী? কোন কোন চরিত্র সেই দ্বন্দ্বের যুক্ত বিশ্লেষণ করে দেখান। দ্বন্দ্বের পরিণাম কী তাও উল্লেখ করুন।
৫. 'লালসালু' উপন্যাস কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।
৬. 'লালসালু' উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কতখানি সার্থক, বিশ্লেষণ করুন।
৭. 'লালসালু' উপন্যাসের নায়ক কে? তার চরিত্রের একটি পরিচয় দিন।
৮. 'লালসালু' উপন্যাসের নায়িকা কে? তার চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।
৯. রহীমা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
১০. 'লালসালু' উপন্যাসের নামকরণ কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।
১১. 'লালসালু' উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।
১২. উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্প ও নাটকের পার্থক্য কী ও কোথায়?

☞ এখানে চূড়ান্ত মূল্যায়নের কিছু নমুনা প্রশ্নের উত্তর দেয়া হল। যেগুলো লিখে দেয়া হয়নি সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন-১ : উপন্যাস কাকে বলে? উপন্যাসে কি কি উপাদান প্রয়োজন, উল্লেখ করুন।

উত্তর : শব্দটির আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে– উপন্যাস হচ্ছে বিশেষ ধরনের কল্পিত উপাখ্যান। আবার এও বলা হয়েছে যে উপন্যাসের অর্থ কথারম্ভ – শ্রোতা বা পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য কল্পিত গল্প বা কাহিনী। ইংরাজি ভাষায় উপন্যাসের প্রতিশব্দ Novel এর আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে- 'a fictitious prose narrative or tale presenting a picture of real life of the men and women portrayed' অর্থাৎ Novel বা উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে রচিত কল্পিত কাহিনী যার মধ্যে বর্ণিত মানব মানবীর বাস্তবজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। Novel কে এ কারণে (Fiction) বা বানানো কাহিনীও বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত বিশেষভাবে উপস্থাপিত এমন এক ধরনের কাহিনী যার মধ্যে বর্ণিত মানব-মানবীর বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

আভিধানিক অর্থ এবং উপরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই আমরা উপন্যাসের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। উপন্যাসে প্রয়োজন :

(১) মানুষের বাস্তব জীবনের সুবিন্যস্ত একটি কাহিনী, (২) নরনারী বা চরিত্র, (৩) গদ্যভাষা (৪) লেখকের একটি উপলব্ধিজাত বক্তব্য।

১. কাহিনী

দেখা যায়, কাহিনীই উপন্যাসের প্রধান উপাদান, কাহিনী ছাড়া উপন্যাস হয় না। কিন্তু যে কোন কাহিনী দিয়ে উপন্যাস হয় না। (ক) কাহিনীটিকে হতে হবে মানবিক। অর্থাৎ ঈশ্বর দেবতার প্রাধান্য নিয়ে যেমন উপন্যাসের কাহিনী তৈরি হবে না, তেমনি তা ভূত প্রেত দৈত্য দানবের কাহিনীও হবে না। উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠবে মানব-মানবী এবং তারা যে জীবন যাপন করে সেই বাস্তব জীবনকে নিয়ে। আবার এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মানব-মানবীর কাহিনী হলেও তা উপন্যাস হবে না। (খ) কাহিনীটিকে হতে হবে আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক করার জন্য কাহিনীর ঘটনাবলীকে সুবিন্যস্ত করে কাহিনীটি নির্মাণ করা হয়। কাহিনীর আরম্ভ বিস্তার এবং পরিণতি

এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত পাঠ করার আগ্রহ পাঠকের মনে জেগে থাকে। কাহিনীতে ঘটনার এ বিন্যাসকে ইংরাজিতে বলা হয় প্লট।

২. চরিত্র

কাহিনী তৈরি হয় ঘটনা দিয়ে। একটি ঘটনা একাধিক ঘটনার জন্ম দেয় বলে কাহিনী অগ্রসর হয়ে একটি পরিণতিতে পৌছায়। আমরা জানি ঘটনা আপনা আপনি ঘটে না। ঘটনা ঘটায় মানুষ। তার চিন্তা, কল্পনা আশা, তার প্রবৃত্তি, যেমন ঘৃণা, ক্রোধ, লোভ প্রেম হিংসা দয়া ইত্যাদি এবং তার নানা আচরণ, যেমন যে ধীর কিংবা অসাধু বা কলহ পরায়ণ, অথবা ক্ষমাশীল এসবই তাকে দিয়ে নানান ঘটনা ঘটায়। এমতাবস্থায় ঘটনা ঘটক মানব-মানবীরা না থাকলে কাহিনী নির্মাণই অসম্ভব। সুতরাং উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান এর কাহিনীর মানব-মানবী বা চরিত্র ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Character।

৩. উপন্যাসের ভাষা

উপন্যাস গদ্যে লিখিত হয়ে থাকে। কারণ বাস্তব জীবন যেহেতু উপন্যাসের অবলম্বন, যেহেতু সেই বাস্তব জীবনের বর্ণনা সেই ভাষাতেই হওয়া উচিত যা বাস্তব জীবন সংলগ্ন। অর্থাৎ যে ভাষা দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাতেই উপন্যাস লেখা হয়। ছন্দোময়, অলঙ্কৃত ভাষা দিয়ে বাস্তবজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলেই গদ্যকে উপন্যাস রচনার মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. উপন্যাসের বক্তব্য

সর্বোপরি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখকের উপলব্ধিজাত একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কালজয়ী ও মহৎ সকল উপন্যাসেই মানবজীবন সম্পর্কিত গভীর কোন সত্যকে তুলে ধরা হয়। যেমন মহান রুশ লেখক দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে এ জীবন সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে যে, পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে নয়। আমাদের পাঠ্য 'লালসালু' উপন্যাসেও একটি বক্তব্য আছে, আর তা হল- কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, শোষণ এবং প্রথার বিরুদ্ধে মুক্ত চিন্তা, স্বাভাবিক প্রাণধর্ম এবং শোষণ থেকে মুক্তির জন্য মানুষের সংগ্রাম কখনোই থেমে যায় না। সেই কারণে কুসংস্কার ও ভণ্ডামির প্রতীক মজিদের সঙ্গে তার তরুণী স্ত্রী জমিলার যে দ্বন্দ্ব, তার ফয়সালা লালসালু উপন্যাসে দেখানো হয়নি।

প্রশ্ন ২। লালসালু কোন শ্রেণীর উপন্যাস? এবং কতখানি সার্থক তা বুঝিয়ে দিন।

উত্তর : 'লালসালু'তে যেহেতু রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গ নেই, এবং ঐতিহাসিক কোন বিষয়ও নেই, সেহেতু এ উপন্যাস রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এ উপন্যাসের মধ্যে একটি গ্রামীণ সমাজের কাহিনী আছে, যে সব ঘটনা ও চরিত্রকে আমরা দেখি সেগুলি সবই সামাজিক। সুতরাং বিষয়ের দিক থেকে বিচার করে দেখলে 'লালসালু'কে সামাজিক উপন্যাস হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়।

এর কাহিনী এমনই এক গ্রামীণ সমাজের, যার পরতে পরতে কেবলই দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস আর প্রতারণা। মানুষের মনে ভয় ঐশী শক্তি সম্পর্কে এবং যখন তাকে ভয় দেখানো হয় যে, তুমি যা করছ তা গুণাহ'র কাজ কিংবা তুমি ধর্মীয় বিধানকে অমান্য করছ, অথবা তুমি এ কাজ করলে তোমার মঙ্গল হবে, তখন সে ভয় পেয়ে কোনো কাজ থেকে নিবৃত্ত হয় অথবা কোনো কাজ সম্পাদন করে। নিজের যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে যে কোন কিছু বিবেচনা করে না, তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, একটি সামগ্রিক ভীতি, মান্যতা, পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতার সঙ্গে সে আজীবন বাঁধা।

মহব্বত নগর গ্রামটিতে এ ধরনের মানুষদের নিয়ে সমাজ। এ সমাজে এসে ঠাঁই নেয় ভণ্ড, প্রতারক ও ধূর্ত মজিদ। গ্রাম প্রান্তের একটি পুরাতন কবরকে সে একজন মোদাচ্ছের পীরের কবর বলে ঘোষণা দেয় এবং সেটিকে মাজারে রূপান্তরিত করে। মাজারের সেবক হয়ে সে গ্রামবাসীর ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং নানান সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে সে ক্রমে জমিজমার ও মালিক হয়ে বসে। সে গ্রামের মানুষকে ধর্ম-কর্মে মতি না থাকায় শাসন তো করেই, এমনকি গ্রামবাসীর পারিবারিক সমস্যা নিয়েও সালিশ বসায় এবং সুকৌশলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তিও দিয়ে দেয়। গ্রামের মাতব্বর ও সচ্ছল লোক খালেক ব্যাপারীকেও সে নিজের কব্জায় এনে ফেলে। তার বন্ধ্যা প্রথমা স্ত্রীকে

মাজারের চারদিকে সাত পাকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করে। কারণ সে ইতিমধ্যে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে ওই কাজটি করা হলে মেয়ে লোকটির দোষ কেটে যাবে এবং সে সন্তান সম্ভবা হবে। সাতপাক ঘোরার অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় না, কারণ তার আগেই বেপারীর স্ত্রী শারীরিক দুর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু তাতে মজিদের আধিপত্যের হানি ঘটে না। এমনই কাণ্ড ঘটে আক্কাস আলীর ক্ষেত্রে। স্কুলে পড়ার কারণে ছেলেটি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতো সে জন্যে সে গ্রামে একটি স্কুল বসাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজিদের কুচক্রে সে সফল হতে পারে না। এ ভাবেই লালসালু উপন্যাসে মজিদের জীবন যাপন ও তার আত্মপ্রতিষ্ঠার বর্ণনা দেয়া হয়েছে নানান সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করে। সারা উপন্যাসেই সমাজের ভিতর ও বাহিরকে লেখক খুলে খুলে দেখিয়েছেন। তবে সেজন্যেই আমরা 'লালসালু'কে সামাজিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

তবে এও লক্ষ্য করার বিষয় এ যে কাহিনীর মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি রয়েছে তা কিন্তু সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে নয়। কুসংস্কার, অল্পবিশ্বাস, প্রথাবদ্ধতা, এসবের বিরুদ্ধে কোনো সাংগঠনিক প্রতিরোধের ঘটনা আমরা দেখি না। সুতরাং দ্বন্দ্বটি প্রকাশ্য নয়। এটি রয়েছে ব্যক্তিক ভাবে এবং মানবিক স্তরে। দ্বন্দ্বটি কী? নানা কুসংস্কার প্রথা ও ধর্মান্ধতা একদিকে, আর অন্যদিকে সহজ প্রাণধর্মের মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। একদিকে মজিদ তার সকল শক্তি, কূটচাল, ও ভয়াবহ ক্ষমতা নিয়ে শাসন করে দুমড়ে মুচড়ে দিতে চায় প্রাণধর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জমিলাকে, আর অন্যদিকে জমিলা সকল রকম শাসন ও শাস্তির পরও থাকে অনমনীয়। দুই প্রতিপক্ষের এ দ্বন্দ্বটি ফুরিয়ে যায় না কিংবা হারিয়েও যায় না। অনমনীয়া জমিলা মাথা নোয়ায় না, আত্মসমর্পণ করে না আর তাতেই মজিদ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বন্দ্বের পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে। সেই জন্য সামাজিক উপন্যাস হলেও লালসালু মনস্তত্ত্ব নির্ভর – তাই এ উপন্যাসকে আমরা মনস্তত্ত্বনির্ভর সামাজিক উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

প্রশ্ন ৩। লালসালু উপন্যাসে একটি দ্বন্দ্ব আছে, সেই দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি কী এবং কোন কোন চরিত্র সেই দ্বন্দ্বে যুক্ত বিশ্লেষণ করে দেখান, দ্বন্দ্বের পরিণাম কী তাও উল্লেখ করুন।

উত্তর : মানুষ ও তার বাস্তব জীবনের বিষয় অবলম্বন করেই উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়। মানুষের জীবন যেহেতু দ্বন্দ্ব সংঘাতময়, উপন্যাসের কাহিনীতেও সেই কারণে এক বা একাধিক দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। 'লালসালু' উপন্যাসকে আমরা দেখি এর বিষয় দরিদ্র কৃষিজীবী অধ্যুষিত মহব্বত নগর গ্রামের মানুষদের জীবন যাপনের নানান ঘটনাবলী এবং চরিত্র ঐ গ্রামের মানুষেরা। ঐ গ্রামের মানুষ চাষাবাদ করে যা উৎপাদন করে তাতে তাদের দারিদ্র্যদশা কখনোই ঘোচে না, তাদের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নেই, বৃহত্তর জগৎ এবং জীবন সম্পর্কেও তাদের কোন রকম ধারণা নেই এবং সে সম্পর্কে ধারণা লাভের কোন আগ্রহও কখনও হয় না। তাদের মনের ভেতরে একটার পর একটা প্রাচীন কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের দেয়াল। তাদের অবিচল বিশ্বাস ভাগ্যে এবং অলৌকিতত্ত্বে। নিজেদের সকল অসহায়তাকে তারা ভাগ্য বলে মেনে নেয়। যদি কেউ সুকৌশলে কোন বিষয়, জ্ঞান, বা ব্যক্তির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করতে পারে, তাহলে তারা তা অকাতরে মেনে নেয় এবং ঐসব বিষয় জ্ঞান এবং ব্যক্তির মধ্যে ঐশী শক্তির মহিমা দেখতে পায়।

একশ্রেণীর ধূর্ত মানুষ সরলচিত্ত দরিদ্র গ্রামবাসী মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে যথেচ্ছ শোষণ করে এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। 'লালসালু' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক আচরণ দেখিয়ে প্রথমত গ্রামের লোকদের বিস্মিত করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে নিজেকে সৎ, ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সে গ্রাম-প্রান্তে একটি ভাঙ্গা কবরকে এক মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে শনাক্ত করে এবং কবরটি সংস্কার করে তার ওপর লাল সালু দিয়ে ঢেকে দেয়। একই সঙ্গে সে নিজেকে ঐ মাজারটির রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে ঘোষণা করে। লোকের বিশ্বাস অর্জনের জন্য সে এ রকম একটি গল্প ফাঁদে যে গারোদের দেশে সে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল, এ মাজারে যে পূণ্যাত্মাশায়িত তাঁর স্বপ্নাদেশেই সে এ গ্রামে এসেছে এবং মাজারটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। এ ধূর্ত কৌশলের ফলেই সরল, ধর্মভীরু ও দরিদ্র গ্রামবাসী এবং গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খালেক ব্যাপারী পর্যন্ত মজিদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও অনুগত হয়ে পড়ে এবং তাকে ভয়ও পেতে শুরু করে। জমিজমার মালিক হতে তার বেশি সময় লাগে না এবং সে শক্ত-সমর্থ একজন মহিলাকে বিয়েও করে

ফেলে। দেখতে দেখতে সে গ্রামের মধ্যে অশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। তাহেরের বাপের পারিবারিক কোন্দলের মধ্যে সে নাক গলায়। স্বল্প শিক্ষিত যুবক আক্কাস আলী গ্রামের একটি স্কুল খোলার আয়োজন করলে মজিদ তার এমন হেনস্থা করে যে তার বাবা মাপ চাইতে দিশা পায় না। মজিদ হয়ে ওঠে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, শাসন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক। সে নিজেকে ঘিরে এমন এক জগৎ তৈরি করে যেখানে বিরোধিতা নেই, প্রতিবাদ নেই, উল্লাস নেই, আনন্দ নেই, গান নেই, সেখানে কেবল শাসন আর আনুগত্য। মজিদের জগৎ একটি বিশাল অচলায়তন হয়ে উঠে।

কিন্তু ঐ জগৎ সত্য নয়, কারণ আমরা জানি জগতের মূলে থাকে প্রাণ-প্রাণ না থাকলে জগৎই তৈরি হয় না। আর প্রাণের ধর্ম তা অগ্রসরমান, বিকাশমান চঞ্চল এবং স্ফূর্ত। প্রাণময় মানুষ হাসে, কাঁদে, গান গায় উল্লসিত হয় এবং এ প্রক্রিয়ার প্রাচীন নিয়মের বেড়া ভাঙ্গে। কুসংস্কার গুঁড়িয়ে দেয়, অন্ধবিশ্বাসের ভূতকে তাড়ায়, সে কৌতূহলী হয় জগৎও জীবনকে জানতে চায়। পুরনো জগতের ওপর নতুন জগৎ নির্মাণ করে। নবীন প্রাণময়তার এ শক্তিই হচ্ছে কুসংস্কার শাসন এবং অন্ধবিশ্বাস এবং প্রশ্নহীন আনুগত্যের বিপরীত শক্তি। এ দুই শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে লালসালু উপন্যাসে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে মারামারি লাঠালাঠির মাধ্যমে নয়। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে প্রায়শই দৃষ্টিগ্রাহ্যতার বাইরে– যা ফুটে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের আবরণে এবং কথাবার্তায়।

নবীন প্রাণময়তার প্রতীক হচ্ছে জমিলা। সে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী, বয়সে তরুণী, স্বভাবে চঞ্চল এবং হাসিখুশি। প্রথমা স্ত্রী রহীমা তরুণী সতীনটিকে নিজের মেয়ের মতোই আপন করে নেয়। জমিলা উচ্চ স্বরে কথা বলে, হাসে মজিদ ধমক দিলেও তাতে কান দেয় না। সে স্বামীর বিছানায় শুতে চায় না। নামাজ পড়েছে কিনা সে কথাটাও বলে না। বাড়িতে জিকিরের আসর বসানো হলে সে বাইরে বেরিয়ে যায়- পর্দাপুশিদার কথা বিবেচনা না করেই। এ ভাবে মজিদের চোখে জমিলা ক্রমেই হয়ে ওঠে দুর্বিনীত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছাচারী। এমন অবস্থায় মজিদ জানায় যে জমিলার ওপর কোন দুষ্ট আত্মা ভর করেছে এবং সেজন্যে তাকে রাতের বেলা মাজারে বেঁধে রাখা হবে। ঐ নিষ্ঠুর কাজটা মজিদ সত্যিই করে। পেছনে অন্ধবিশ্বাস এবং ধূর্ততা কাজ করলেও সে নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। তার কেবলই সংশয় জাগে তার সংসার আর অন্ধবিশ্বাসে ও কুসংস্কার দিয়ে গড়া জগৎটি বোধ হয় আর অটুট থাকে না। সেখানে যে ফাটল ধরেছে তা সে টের পায়। কিন্তু সে পরাজিত হতে চায় না। সে হয়ে ওঠে আরও একরোখা এবং জেদী। জমিলার মাজারে সংলগ্ন একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এ সময় বাইরে শুরু হয় তুমুল শিলাবৃষ্টি। তাতে ফসল হানির আশঙ্কায় গ্রামবাসীদের মধ্যে হায় হায় শুরু হয়ে যায়। জমিলাকে মাজারে বেঁধে রাখার ঘটনায় রহীমার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। স্বামীর হুকুমের দাসী ছিল সে এতোকাল। কিন্তু ঐ ঘটনার পর সে আর অমন অনুগত থাকতে পারে না। ঝড়বৃষ্টি থামানোর জন্য দোয়া দরুদ পড়ার কথা। সেই দোয়া দরুদ পড়ার জন্য তাগিদ দেয় মজিদ কিন্তু রহিমা তা শুনেও শোনে না। এভাবে জমিলার ভেতর দিয়ে যে প্রাণময়তার প্রকাশ, সেই প্রাণময় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি রহীমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রাণময় তারণ্যের যে উত্থান দেখতে পাই জমিলার মধ্য দিয়ে তার পরিণাম কী হয় শেষ পর্যন্ত তা লালসালু উপন্যাসে দেখানো হয় নি– কিন্তু দ্বন্দ্বটি যে আছে, এবং থেকে যাবে আরও বহুকাল এ আভাসের মধ্যদিয়ে লালসালু উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪। লালসালু উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কতখানি সার্থক, বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসাধারণ কুশলী ছিলেন তা তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’র চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারি। মজিদ চরিত্র তাঁর উপন্যাসের স্তম্ভ বিশেষ। তবে সে ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। লালসালু উপন্যাসের প্রথম দিকেই একটি বৃদ্ধ পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই আমরা, তাকে তাহেরের বাবা বলে পরিচিত করানো হয়েছে। নামবিহীন এ বৃদ্ধটিকে অল্প সময়ের জন্য আমরা পাই কিন্তু তার ঐ অল্পক্ষণের অবস্থিতিই পাঠকের মনে গভীরভাগে দাগ কেটে যায়। বুড়ো লোকটি বদরাগী এবং জেদী এককালে সে স্বাভাবিক এবং বুদ্ধিমান মানুষই ছিল। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে জোতজমি নিয়ে মারামারি ও মামলা মোকদ্দমা করে শেষ বয়সে সে সব দিক দিয়ে নিঃস্ব। তার তিন ছেলে সংসারের আয় বাড়াতে পারে না। ফলে দারিদ্র্যের পীড়ন সর্বক্ষণের সঙ্গী। বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে তার অষ্টপ্রহর কলহ কখনও কখনও সে স্ত্রীকে প্রহারও করে। তার সংসার একটি দোজখ বিশেষ। স্বামীর অত্যাচার অসহ্য হলে বৃদ্ধা স্ত্রী স্বামীকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করে। এক

পর্যায়ে সে স্বামীর পুরুষত্ব নিয়েও কটাক্ষ করে জানায় যে তার সন্তানেরা বৃদ্ধের ঔরসজাত নয়। ঘটনাটি এমনই কুৎসিত যে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা একটা বিহিত প্রার্থনা করে মজিদের কাছে। যথাসময়ে সামাজিক বিচার বসে এবং তাহেরের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। জানতে চাওয়া হয় যে তার বৃদ্ধ স্ত্রী তাকে কী বলে থাকে। তাহেরের বাপ মুখ খুলতে চায় না। তার পারিবারিক কথা বাইরে কেন বলতে যাবে। কিন্তু যখন জানতে পারে যে বাইরের লোকদের কাছে ঐসব কথা জানাজানি হয়ে গেছে এবং তাতে তার নিজের মেয়ের ভূমিকা প্রধান, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেয়েকে ধরে পিটায়। তাতে পুনরায় বিচার বসে এবং মজিদ বুড়োর মনের ভেতরে যেখানে ক্ষত সেইখানে খুঁচিয়ে তার পৌরুষের অহমিকা ধূলিসাৎ করে দেয়।

বুড়ির কথা সত্য কি না এ প্রশ্ন বার বার করা হলে সে ক্রুদ্ধ জবাব দিয়ে বলে– 'বুড়ি মাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়– তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল মোহরত দিমু' আর মেয়েকে ঠেঙানোর কথা তোলা হলে সে সোজাসুজি জবাব দেয় যে তার মেয়েকে সে ঠেঙিয়েছে তাতে অন্যের কী? বলা বাহুল্য বৃদ্ধ লোকটির ব্যক্তিত্ব পৌরষ দীপ্তই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। মজিদ দোয়া দরুদ পড়ে, সুরা আবৃত্তি করে। চাপ প্রয়োগ করে বুড়োকে দিয়ে মেয়ের কাছে মাফ চাওয়ায়। কিন্তু তারপর গৃহত্যাগ করে যে কোথায় যায় তার হদিশ আর কেউ পায় না। বোঝা যায়, লেখক এ বৃদ্ধটিকে দিয়ে ভূমিলগ্ন তৃণমূলের মানুষের চরিত্রগত দৃঢ়তাটি কেমন তা দেখাতে চেয়েছেন। তাহেরের বাপ অবশ্যই একটি প্রতিনিধি চরিত্র।

প্রতিনিধিত্বশীল আর এক চরিত্র খালেক ব্যাপারী। সে ভূস্বামী এবং এ সুবাদে গ্রামের সামাজিক নেতৃত্বও তারই কাছে। উৎসব পার্বন, ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা গ্রামের সকল ক্রিয়াকাণ্ডই চলে মাতব্বরের নির্দেশে। মহব্বতনগর গ্রামে এসে মজিদ প্রথমে খালেক ব্যাপারীর বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। ক্রমে মজিদ মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত করে। কিন্তু এ ব্যাপারে খালেক ব্যাপারী কখনোই বিরোধিতা করে নি।

এই-ই নিয়ম। সামন্তবাদী ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেই সমাজে ভূমির মালিকদের সঙ্গে ধর্মীয় পুরোহিতদের পরস্পর নিবিড় সম্পর্ক থাকবার কথা। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খালেক ব্যাপারী জানে, "অশান্ত অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটা পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমিজোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক। "ভূমি মালিকদের শোষণ ও অপকর্মের দোসর ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীরা। তারা মানুষের মনের ভেতরকার কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস জিইয়ে রাখে মানুষের চেতনাকে বিকশিত হতে দেয় না, অধিকার বোধ জাগ্রত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে আর তা করে বলেই জমির মালিকরা জমিহীন কৃষকদের যথেচ্ছ শোষণ করতে পারে। সুতরাং খালেক ব্যাপারী এবং মজিদের সম্পর্ক খাপে খাপে মিলে থাকবার, বিচ্ছিন্ন হবার নয়। তাই মজিদের কোন কাজেই সে বাধা দেয়নি, বরং মজিদ যা করেছে তার সবই সে সমর্থন করেছে। এক পর্যায়ে দেখা যায় সে মজিদকে ভয় পেতে শুরু করেছে। তার পরামর্শে সে প্রথমা স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিয়েছে।

এদিক দিয়ে দেখলে খালেক ব্যাপারীকে দুর্বল চিত্তের লোকই বলতে হবে। কারণ নিয়ম হল এই যে, সামন্ত প্রভুর অনুগত হবে পুরোহিত। খালেক ব্যাপারীর চরিত্রে আমরা দৃঢ়তা কখনোই লক্ষ্য করি না। বরঞ্চ দেখি, প্রায় সব ক্ষেত্রেই মজিদের কথার সুরে তাকে সুর মিলাতে। খালেক ব্যাপারীর চরিত্রের অবস্থান উপন্যাসের প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত থাকলেও তার ভূমিকা কখনোই সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে নি। লেখক এ চরিত্রটির যথাযোগ্য বিকাশ ঘটাতে পেরেছেন এমন কথা আমরা বলতে পারি না।

লালসালুর দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে, দুটিরই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমা– স্বামীর চিন্তা ও কর্মের নিঃসন্দিগ্ধ সমর্থক। স্বামী যা করে এবং বলে সবই অবশ্য করণীয় বলে সে মনে করে। মজিদ বিয়ের পর থেকেই তার হাঁটা-চলা, কথাবলাসহ সকল ব্যাপারে তাকে শাসন করে এবং সেই শাসন নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। তার সন্তান না হওয়ার ব্যাপারেও স্বামী যা বলে তাই সে বিশ্বাস করে। তার বৌ-এর নাকি চৌদ্দটি বেড়ি আছে যার কারণে সে মা হতে পারবে না। সাতটি পর্যন্ত বেড়ি থাকলে তা সরানো যায়, তার বেশি পারা যায় না। এ কথাটি যেহেতু স্বামী মজিদ জানায়, সেহেতু এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, কারণ তার স্বামী খোদার লোক এবং সে-ই জানতে পেরেছে যে খোদার ইচ্ছায় ঐ চৌদ্দ বেড়ির বন্ধন তার পেটে যার অন্য কোনো প্রতিবিধান নেই। তার হৃদয় স্নেহ মমতায়পূর্ণ দুঃস্থ-দরিদ্র প্রতিবেশী গ্রামবাসীর বিপদ ও ক্লেশ মুক্তির জন্য সে নামাজ শেষে প্রতিদিন মোনাজাত করে। স্বামী মেয়ের বয়সী

একটি মেয়েকে বিবাহ করে ঘরে আনলে তাকে সে পরম স্নেহে বুকে টেনে নেয় এবং তাকে মেয়ের মতোই ভালবাসে। হাসুনীর মায়ের দুঃখের সমব্যথী শুধু সেই। অন্য কেউ নয়। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী সন্তান কামনায় রোজা রেখে মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাকেই ছুটে যেতে দেখা যায়। পরিশেষে দেখা যায় তার মাতৃত্বের অনুভূতি তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব দান করে। যখন প্রাণধর্মে উচ্ছ্বল জমিলাকে অন্যায়ভাবে শাসন করতে আরম্ভ করে মজিদ, তখন থেকেই তার মন জমিলার দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করে। জমিলাকে মজিদের ক্রোধ থেকে আড়াল করে রাখে সে। স্বামীর দিকে কখনো সে মনের ভেতরে প্রশ্ন নিয়ে তাকায় নি। কিন্তু যখন দেখে মজিদ তরুণী স্ত্রীর প্রাণধর্মের সহজ উচ্ছ্বলতা মেনে নিতে চায় না, তখনই মজিদের প্রতি সর্বাঙ্গীন আনুগত্য সে আর অটুট রাখতে পারে না। জমিলাকে চূড়ান্ত শাস্তি দেয়ার জন্য যখন অন্ধকার মাজার ঘরে একাকী বেঁধে রাখে, তখন আর নিজেকে সে সংযত রাখতে পারে না। একই সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হলে তাকে নামাজ পড়তে বলা হয়। কিন্তু স্বামীর সেই নির্দেশ সে উপেক্ষা করে। শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে একথা মজিদ স্মরণ করিয়ে দিলে সে স্বামীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে পরিস্কার গলায় বলে, 'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভেতরে।'

"যে রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়" সেই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না। রহীমা বরং স্বামীকেই হুকুম করে।

এভাবে শাসন আর শৃঙ্খলার কঠিন নিগড়ে বাঁধা যান্ত্রিক আচরণে অভ্যস্ত একজন নারী অনুভূতি ও প্রকাশ ক্ষমতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবী হয়ে ওঠে।

জমিলা বয়সে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণী, তাকেই প্রায় বৃদ্ধ মজিদ বিয়ে করে আনে। কেন এ কাজ করে মজিদ সেটা পরে নিজেও খুঁজে পায় নি। হতে পারে তার পিতা হবার সাধ হয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে উচ্ছ্বল, প্রাণময় তারুণ্যকে বন্দী এবং পীড়ন করার কোন বাসনা তার অবচেতনায় কাজ করেছিল। যেভাবেই হোক সে জমিলার উচ্ছ্বাস, হাসি, চাঞ্চল্য, ঘরের বাইরের দিকে তাকানো এসব ব্যাপারে শাসন করতে শুরু করে। একদিন জিকিরের আসর বসানো হয় এবং ঐ জিকিরের আসর চলা সময়ে জমিলা সম্মিলিত আওয়াজে ঘোরগ্রস্ত হয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। এ ঘটনায় মজিদ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে শাসন করে তাকে অন্ধকার মাজার ঘরে এক খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে।

জমিলা প্রথমে নীরব প্রতিবাদ জানাত। যখন নির্যাতন বেড়ে গেল তখন সে সরব হল এবং নির্যাতন অসহ্য হলে সে ঘৃণা প্রকাশ করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে সে মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং শোষণের স্তম্ভ বিশেষ যে মজিদ যে আওয়ালপুরের পীর সাহেবকে গ্রামছাড়া করেছে, স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী তরুণ আক্কাসকে যে গ্রাম থেকে তাড়িয়েছে, অশেষ ক্ষমতাবান খালেক ব্যাপারী যার হাতের পুতুলের মতো, সেই মজিদের সকল প্রতাপ, দম্ভ, অহমিকা সবই অর্থহীন হয়ে যায় তরুণী জমিলার বিদ্রোহের ফলে। জমিলা চরিত্র যে বাংলা সাহিত্যে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি সৃষ্টি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস হলেও এ উপন্যাসেই তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৫ : রহীমা চরিত্র বিশ্লেষণ করুন, এবং লালসালু উপন্যাসে এ চরিত্রের গুরুত্ব কতখানি উল্লেখ করুন।

উত্তর : রহীমা 'লালসালু' উপন্যাসে অন্যতম প্রধান চরিত্র। কারণ নায়ক মজিদের সে প্রথম স্ত্রী এবং উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি। তবে শক্তিময়ী লম্বা-চওড়া এ রমণীকে তার সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে দেখা যায় না। লেখক নিজেই বলেছেন– "তার শক্তি তার চওড়া দেহ–তা বাইরের খোলসমাত্র, আসলে সে ঠাণ্ডা ভীতু মানুষ" তার এ ঠাণ্ডা ও ভীতু স্বভাবেরও আবার কারণ আছে, আর তা হলো, "মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়"– কেন না "শীর্ণ মানুষটির (মজিদ) পেছনে সে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।"

ফলে প্রথম থেকেই সে স্বামীর একান্ত অনুগত। স্বামী তাকে ধীর পায়ে নিঃশব্দে হাটতে বললে, সে তা-ই করে, আস্তে কথা বলতে বললে সে প্রতিবাদ করে না এবং মাজার সম্পর্কে ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা যা যা বলে সবই সে যেন নির্বিকারে বিশ্বাস করে। রহস্যময় মাজারটির অলৌকিক একটি শক্তি আছে বলে তার অন্ধবিশ্বাস। আর এ সুবাদেই তার ধারণা, যে তার স্বামী মজিদ একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ–পৃথিবীর কোনো সমস্যার সমাধান তার অসাধ্য

নয়। এ রকম ধারণা ও বিশ্বাসের কারণেই তার দৈনিক সাধনা ছিলো কী ভাবে সে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই সে মহব্বতনগর গ্রামের অন্তঃপুরগুলিতে মজিদের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত করে নেয়।

রহীমার দৈহিক শক্তি বিপুল, সাংসারিক কাজে-কর্মেও সে অসাধারণ পারদর্শী। কিন্তু এ বিপুল শক্তি ও পারদর্শিতা তার মনে স্বাতন্ত্র্যের কোনো চেতনা জাগায় না। স্বামীর আদেশ পালন এবং তার মনকে তুষ্ট রাখা ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ আছে বলে সে মনে করে না।

কিন্তু সে-ও মানুষ এবং মেয়েমানুষ। নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে, কিন্তু তার কোলে সন্তান নেই, এ মর্মবেদনার ভার তাকে বহন করতে হয় সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মাতৃস্নেহ, স্বাভাবিক প্রতিবেশী সুলভ সৌজন্য, দরিদ্র ও ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি মায়া-দয়া– এসব মানবিক গুণাবলী ও তার মধ্যে যথেষ্টই দেখা যায়। হাসুনীর মায়ের দুঃখের সমব্যথী একমাত্র সে-ই, আর কেউ নয়। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী সন্তান কামনায় রোজা রেখে মাজার প্রদক্ষিণ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য রহীমাকেই আমরা ছুটে আসতে দেখি, নারীর জীবনে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা ও ঈর্ষার পাত্রী তার সতীন, কিন্তু সেই সতীনকে সে গভীর স্নেহ-মমতায় জড়িয়ে ধরে। কিশোরী বধূ জমিলাকে কাছে পেয়ে তার তৃষাতুর মাতৃহৃদয় তৃপ্তির সন্ধান পেয়ে যায়। জমিলার নানান দোষত্রুটি, নানান ছেলেমানুষী, মজিদের সংসারে বেমানান নানান আচরণ–সবই সে ঢেকে রাখে।

তবু আমরা জানি তার অস্তিত্বের সমস্তটাই ছিলো এক রকমের নিঃশর্ত আনুগত্য। তার ব্যক্তিগত সুঃখদুঃখ, সংসারের চিন্তা জীবন-যাপন সবার ঊর্ধ্বে ভেবে নিয়েছিলো স্বামীর শাসন এবং নির্দেশকে। বলা যায় নিজের সত্য পরিচয়টাও তার অজানা ছিলো। কিন্তু তার মাতৃত্বের অনুভূতি তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে দেয়। যখন দুর্বিনীত জমিলাকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করে মজিদ তখনই তার অন্তরাত্মবিদ্রোহ করে। তখনো স্বামীর দুর্বলতা তার চোখে ধরা পড়েনি। প্রাণধর্মের সহজ উচ্ছলতা দেখে মজিদকে চিন্তিত হতে দেখে সে বুঝে যায় কোথায় মজিদের দুর্বলতা। কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রকাণ্ড দেয়ালটা তার মনের ভেতরে আর অটুট থাকে না, মজিদ সম্পর্কে যে রহস্যময়তা ছিলো, ভয় ছিলো তাও যেন তার কতকাংশে কেটে যায়। এ অবস্থায় বরং মজিদের প্রতি তার মায়া হয়। ঐ মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হলে তাকে নামায পড়তে বলা হয়, কিন্তু স্বামীর সেই নির্দেশ সে উপেক্ষা করে। ঐ মুহূর্তটিতে মাজার ঘরের অন্ধকারে বেঁধে রাখা জমিলার জন্যেই তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে একথা মজিদ স্মরণ করিয়ে দিলে, রহীমা যেন গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে–

'ধান দিয়ে কি হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভেতরে।'

আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি, "যে রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রূবতারার মতো অনড়" *সে-ই* যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।" রহীমা বরং স্বামীকেই হুকুম করে। রহীমার এ শক্তি আসে কোন উৎস থেকে? আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উৎস একটাই– আর সেটা হলো মানবিক প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মের প্রেরণাতেই তার মনে মাতৃত্বের জাগরণ এবং সেই মাতৃত্ববোধই তার ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়েছে। তার এ অনুভূতি বেরিয়ে এসেছে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং ভয়ের প্রাচীর চুরমার করে। এদিক থেকে রহীমা জমিলা চরিত্রের পরিপূরক বলে মনে করা যেতে পারে। মজিদ, জমিলা, তাহেরের বাবা এসব চরিত্র আসলেই টাইপ চরিত্র। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় মানসিক উত্তরণের যে একটি ব্যাপার থাকে উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বাদে 'লালসালু' উপন্যাসের প্রায় সকল চরিত্রেই সেটি অনুপস্থিত। এ উজ্জ্বল ব্যতিক্রমটি হচ্ছে রহীমা। মানব জীবনে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চালু থাকবে এ সত্যটিকে সে ধারণা করে আছে। সে-ই প্রমাণ করে যে, জমিলারা নিঃশেষিত হয়ে যায় না, তারা রহীমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে এবং সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৬ : লালসালু উপন্যাসে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

উত্তর : শহর ও নগরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনের ঘাতসংঘাতময় এবং প্রেম প্রীতিপূর্ণ বিষয়গুলির সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের একটি সহজ যোগাযোগ আছে। এ যোগাযোগ বাংলা উপন্যাসের উভয় কাল থেকেই। তাই বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন নানাভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, শহর বা নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমগ্র বাংলার জনসংখ্যার অতিক্ষুদ্র একটি অংশ। তাই ঐ ক্ষুদ্র শ্রেণীর জীবনযাপনের চিত্র সমগ্র বাংলার মানুষের জীবন যাপনের প্রতিফলন থাকা সম্ভব নয় এবং তা কখনও থাকেও নি। শতকরা আশি জনেরও বেশি লোক থাকে গ্রামে সেখানেই তাদের বাঁচা-মরা এবং জীবন যাপন। সেই সমাজে এমন সব রীতিনীতি ও ধারণা বিশ্বাস জন্মলাভ করে কায়েমী স্বার্থের দ্বারা লালিত হয়, যুগ যুগ ধরে চালু থাকে যা শহরবাসী শিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তা চেতনার অধিকারী মানুষের কাছে একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার বলে মনে হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর লালসালু উপন্যাসের পটভূমি চরিত্র, বিষয় সবই নিয়েছেন গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা থেকে। 'লালসালু'র পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজ, তার চরিত্র, একদিকে দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসী ধর্মভীরু শোষিত সাধারণ মানুষ আর অন্যদিকে শঠ, প্রতারক ধর্মব্যবসায়ী এবং শোষক ভূস্বামী। আর তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগ-যুগ ব্যাপী শিকড় গাড়া কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।

'লালসালুতে' প্রত্যক্ষ বাস্তবই প্রধান উপাদান। লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান, যেখানে যুগ-যুগ ধরে মানুষের মনের চারিদিক ঘিরে আছে অসম্ভব শক্ত এবং অদৃশ্য একটি বেষ্টনী, মানুষের চিন্তা এবং কল্পনা যার বাইরে যেতে পারে না এবং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেতেও চায় না। মানুষ সেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য এবং ঈশ্বর প্রদত্ত বলে মেনে নেয়। অলৌকিকে তাদের অগাধ বিশ্বাস। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা দৈবশক্তির লীলা দেখতে পায়। আর তাতে, হয় ভয় পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখে নইলে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে একেবারে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে এলাকা নিয়ে লালসালুর পটভূমি সেখানে শস্যের চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি আর ন্যাংটা থাকতেই বাচ্চাদের আমসিপারা শেখানো হয়। শস্য যা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। মানুষের মধ্যে কেবলই কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস সেই সঙ্গে আছে তার অনিবার্য পরিমাণ ভীতি এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ, গেলে তার বিবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। লেখক যেখানে সেটি এমনই এক সমাজ, যেখানে কেবলই শাসন আর শোষণ দেশের দশের এবং সামগ্রিক জীবনের। শঠতা ভণ্ডামী আর কূটকৌশলের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শিকড় সমাজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিছানো। আর ঐসব শিকড় দিয়ে জীবনের সকল প্রাণরস, অর্থাৎ তার বিকাশের সম্ভাবনা, তার হাসি-আনন্দ, তার জীবন সংগ্রামের উদ্যম সব কিছুই প্রতি নিয়ত শুষে দেয়া হয়। এবং এ কাজে ভূস্বামী জোতদার এবং ধর্মব্যবসায়ী একজন আর এক জনের সহযোগী। কারণ স্বার্থের ব্যাপারে তারা একাট্টা– পথ তাদের এক। একজনের আছে মাজার, একজনের আছে জমিজোত প্রভাব প্রতিপত্তি।

মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের দৃশ্যটিই ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচায়ক। মাছ শিকারের সময় তাহের ও কাদের দেখে যে মতিগঞ্জ সড়কের উপর মোনাজাতের ভঙ্গিতে একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখা যায়, ঐ লোকটিই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষদের তিরস্কার করছে কারণ তারা একজন বুজর্গ মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে অবহেলা করে ফেলে রেখেছে। সে অলৌকিকতার অবতারণা করে জানায় যে মোদাচ্ছের পীরের স্বপ্নাদেশে এ গ্রামে এসেছে এবং এখন থেকে সে উক্ত পীরের মাজার দেখা-শোনার দায়িত্ব নেবে। তার ঐ তিরস্কার ও স্বপ্নাদেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধা তার হুকুম পালন করে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড় সংলগ্ন কবরটি পরিস্কার ও মেরামত করে ঝালরঅলা লালসালুতে ঢেকে দেয়া হয়। তারপর আর দেখতে হয় না– কবরটি অচিরেই মাজার হয়ে ওঠে এবং যথারীতি সেখানে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বলে, ভক্ত আর কৃপাপ্রার্থীরা টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন।

ধর্ম ব্যবসায়ীদের এ প্রক্রিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা গ্রামাঞ্চলে বহুকাল ধরে বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ্রামীণ সমাজের এ দিকটি যথার্থভাবেই তুলে ধরেছেন।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মজিদ ঘরবাড়ি ও জমিজমার মালিক হয়ে বসে এবং শক্ত সমর্থ দেখে একটি বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে এবং স্ত্রী রহীমাকে সর্বাংশে অনুগত করে রাখতে তার দেরি হয় না। স্বামী যা বলে, রহিমা তাই মনে

প্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। তার স্বামী অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং খোদার লোক একথা সেতো নিজে বিশ্বাস করে-ই অন্যের মনেও সে একই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে।

গ্রামের মধ্যে ধর্মকার্যের ব্যাপারেই মজিদ নিজের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারও তাকে উপদেশ- নির্দেশ দিতে দেখা যায় এবং গ্রাম্য বিচার সালিশীতে তার ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে। এমন কি গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে সে বাকি রাখে না। তাহেরের বাপের পারিবারিক কর্তৃত্ব নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে। রাগ হওয়াতে নিজের মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিল বলে তাকে মেয়ের কাছে মাপ চাওয়ার জন্য হুকুম দেয় এবং সেই সঙ্গে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি দিতে বলে। খালেক ব্যাপারীর প্রথমা স্ত্রী আমেনা সন্তান কামনায় মজিদের শরণাপন্ন হলে ব্যাপারীকে বোঝায় তার স্ত্রীর পেটে বেড়ি পড়েছে এবং সেই বেড়ি খোলার জন্য তাকে সেহরী না খেয়ে রোজা রেখে মাজারের চারদিকে পাক দিতে হবে সাতবার। কিন্তু নিয়ম পালন করতে গিয়ে আমেনা জ্ঞান হারায়। কিন্তু তবু মাজার এবং মাজারের চালক ব্যক্তিটির প্রতি আমেনা বা তার স্বামী কারুরই কোন অভিযোগ ওঠে না।

আক্কাস নামে এক যুবক ঐ গ্রামে ইস্কুল বসানোর আয়োজন করলে মজিদ এমনই কূট-কৌশল প্রয়োগ করে তাকে নিরস্ত করে যে তারপর আক্কাস গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে একের পর এক ঘটনা এবং মানুষের আচরণের মধ্য দিয়ে গ্রামের সমাজ ও মানুষের জীবন যাপনের বাস্তব চিত্র লালসালু উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর সেই কারণে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন- এ রচনাটিকে বাংলাদেশের একটি সামাজিক দলিল নামেও আখ্যায়িত করা যায়।

প্রশ্ন-৭ : লালসালু উপন্যাসে নায়ক কে? তার চরিত্রের একটি পরিচয় দিন।

উত্তর : লালসালু উপন্যাসের নায়ক মজিদ। শীর্ণ দেহ এ ধূর্ত মানুষটির মহব্বতনগর গ্রামে আগমনের ঘটনাটি নাটকীয়। নিজেকে মানুষের চোখে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজের ঈশ্বরপরায়ণতা দেখাবার জন্য সে প্রথম থেকেই তৎপর। তাকে প্রথম দেখে তাহেরও কাদের নামে দুই মাছ শিকারী ভাই। তখন সে "মতিগঞ্জ সড়কের উপরেই আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।" ঐ একই লোককে তারা পরে দেখতে পার মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে, সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে সমবেত গ্রামবাসীকে ভর্ৎসনা করছে। কারণ তারা এক বুজর্গ পীরের মাজার অনাদর এবং অবহেলায় ফেলে রেখেছে। তার গালাগালের প্রতিবাদ কেউ করে না, বরং সবাই লজ্জায় মুখ নিচুকরে রাখে। ঐ সময় মজিদ জানায় যে মোদাচ্ছের পীরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে সে এ গ্রামে এসেছে। মাজারটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন থেকে তার। গ্রাম প্রান্তে বাঁশ ঝাড়ের পাশে ভগ্নাবস্থার কবরটি সে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সংস্কার করে, জায়গাটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলে এবং কবরটিকে রূপালি ঝালরঅলা লালসালু দিয়ে ঢেকে দেয়। ফলে জায়গাটি সুন্দর মাজারের মতো হয়ে ওঠে। এ ভাবেই মজিদ গ্রামবাসীর মনে শ্রদ্ধা ও ভীতি সঞ্চার করে নিজের স্থান করে নেয়।

জমিজমা বাড়িঘরের মালিক হতে তার দেরি লাগে না। লম্বা চওড়া একটি বিধবা যুবতীকে সে বিয়েও করে ফেলে। স্ত্রী রহীমা শক্তিমতী হলেও শীর্ণ দেহ প্রৌঢ় স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির অন্ত নেই। কারণ লোকটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারের ছায়াটিকে সর্বক্ষণ দেখতে পায়।

শুধু রহীমা নয়, ছায়াটিকে গ্রামবাসী সকলেই দেখতে পায়। ফলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য ভয় ও শ্রদ্ধার ইচ্ছা ও বাসনা সবই চলে যায় ঐ মাজারটির প্রতিনিধি মজিদের নিয়ন্ণে। সে প্রথমেই বৃদ্ধ তাহেরের বাবাকে এমন এক বিপাকে ফেলে যে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার দ্বিতীয় কাজ, আওয়ালপুরের পীর সাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা। ব্যাপারটি রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায় এবং পীর সাহেবকে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরন করতে হয়। তার তৃতীয় কাজ খালেক ব্যাপারীর সন্তানকামী প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ানো। আর তার চতুর্থকাজ, আক্কাস নামক একটি নবীন যুবক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলে তাকে এমনভাবে বিদ্রুপ করে ধমক দিয়ে শাসন করে যে সে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। এ ভাবেই মজিদ তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা নিরঙ্কুশ করে।

বলা বাহুল্য এসব ঘটনা বাইরের সমাজের। কিন্তু তার পারিবারিক জীবনে একটি সংকট তৈরি করে সে অল্প বয়সী মেয়ে জমিলাকে বিবাহ করে। জমিলা চঞ্চল সহজ ও হাসি খুশি স্বভাবের সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে এমন একটি মেয়ে। বন্ধ্যা সতীন রহীমার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায় স্নেহ-মমতার। মজিদ তার চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বলতা শাসন করতে

চায়, কিন্তু পারে না। জমিলার উপর বল প্রয়োগ করতে গেলে সে বিদ্রোহ করে এবং চরম ঘৃণায় স্বামীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। এ ঘটনাটি মজিদকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সে প্রচার করে যে জমিলার ওপর জ্বীনের আসর হয়েছে। জমিলাকে এজন্য সে মাজারের ঘরের অন্ধকারে একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখে। ইতিমধ্যে শুরু হয় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। রহীমা জমিলার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দোয়া দরুদ পড়ার কথা বললে সে মজিদের সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে। বোঝা যায়, মজিদের প্রতিষ্ঠার ভিতে এতো দিনে ফাটল ধরেছে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে ঘটনা বিন্যাসের ভূমিকা। যতোখানি না-তার চাইতে চরিত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা অনেক বেশি। 'লালসালু' এদিক দিয়ে চরিত্র নির্ভর উপন্যাস। আর একটিই এ উপন্যাসের চরিত্র যাকে লেখক বরাবর অনুসরণ করেছেন। দেখা যায়, যতো কিছু ঘটে এবং তাতে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সমস্ত কিছুর পশ্চাতে প্রত্যক্ষে হোক, পরোক্ষে হোক মজিদের নিয়ন্ণ। মানুষের ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে শুধু নয়– তার সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রেও মজিদের প্রবল উপস্থিতি। তাহের-কাদেরের বাবাকে সে প্রায় পাগল বানিয়ে ফেলে। খালেক মাতব্বরের সঙ্গে তার স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধা। খালেক ব্যাপারীর সাধ্য নেই যে সে সন্তান কামনায় অস্থির স্ত্রীর বন্ধাত্ব ঘোচাবার জন্য আউয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পড়া পানি এনে খাওয়ায়। বরং সে নিজেই এমন অনুগত হয়ে পড়ে যে মজিদের কথামতো দীর্ঘকালের দাম্পত্য জীবনকে অস্বীকার করে নিজের স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে মজিদ। প্রথাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়, প্রভু, হতে চায়, চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে। এজন্য সে হেন কাজ নেই যা করে না। নিজেরই ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সে একেকবার ভাবে, মাজার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কুটিল কৌশল অবলম্বন করেছে– সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু এসব চিন্তা তার ক্ষণিকের। সজ্ঞানে সে প্রতারণা করে– কিন্তু তার মানে এ নয় যে সে ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস তার দৃঢ় – এবং সে মনে করে, প্রতারণা ভণ্ডামি যে ভাবেই হোক, মাজার এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে তার টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠার উপর আঘাত কোনদিক থেকে আসতে পারে সে বিষয়ে সে সজাগ। সে জানে, স্বাভাবিক প্রাণধর্মই তার শাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসীরা আনন্দে গান গেয়ে ওঠে তখন সেই গান তাকে বিচলিত করে দেয়। সে ঐ গান বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রহীমার স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় সে বাধা দেয়। আক্কাস আলী স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত অপমানিত করে তাকে গ্রাম থেকে বিদায় করে দেয়। কেন করে সে এসব? করে নিজের প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে মজবুত করার জন্যে। এ সবই তার হিসেবী বুদ্ধির কাজ। অর্থাৎ তার আগমন অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠা প্রতি পর্যায়েই হিসেব মতো চলে সে।

প্রশ্ন উঠতে পারে মজিদের মধ্যে কি স্বাভাবিক মানবিক আবেগ অনুভূতি নেই? সে শুধু কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, স্বার্থপরতা আর শোষণের প্রতিভূ? আমরা দেখি, মজিদ পুরোপুরি প্রতীক চরিত্র নয়। তার কামনা বাসনা আছে। অল্পবয়সী মেয়েকে বিবাহ করে সে– খালেক ব্যাপারীর বউয়ের নরম সুন্দর পা দেখে তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে– দুর্বিনীতা তরুণী স্ত্রী তার মুখের ওপর থুথু দিলে সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়। এসব কারণেই মজিদ চরিত্রটি হয়ে উঠেছে মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তীব্র হয়ে উঠতে দেখি। মৃত প্রায় জমিলাকে মাজার ঘর থেকে নিয়ে আসার পর রহীমা তার শুশ্রূষা আরম্ভ করে– পরম স্নেহে জমিলার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। ঐ দৃশ্যটি মজিদের মনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। মজিদের মনে হয় 'মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে। একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্যে প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্ম-বেদনার তীব্র যন্ণা অনুভব করে সে মনে মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে। অর্থাৎ মজিদ সংস্কার ও স্বার্থের বন্ধনমুক্ত প্রাণময় জীবনের কাছাকাছি পৌঁছে জন্মবেদনার তীব্র যন্ণাটি পর্যন্ত অনুভব করে– কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবজন্ম হয় না তার। কুসংস্কার ভীতি আর মিথ্যার অদৃশ্য দেয়ালের ভেতরেই থেকে যেতে হয় তাকে। মানবিক মমত্ববোধের দৃশ্য তার মনের উপরকার মিথ্যা পাথরটিকে টলিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত উৎখাত করতে পারে না। মজিদ থেকে যায় তার জীবন বিরোধী শোষক এবং প্রতারকের ভূমিকায়।

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মজিদ আসলে ভয়ানক নিঃসঙ্গ । তার কোন আপনজন নেই। কারণ যার যার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়, তারা সবাই তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার শিকার অথবা সহায়ক। সম্পর্কটা সর্বদাই বাইরের প্রয়োজনের, কখনোই অন্তরের নয়। সে কখনোই সৎ এবং আন্তরিক হতে পারে না– কারণ সে জানে, আন্তরিক হলেই তার সত্য স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়লেই তার দুর্বলতা, তার ভণ্ডামি, তার মিথ্যাচার সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে আর তাতে তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিতটি ধসে যাবে। যার অর্থ তার নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। তাই কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে মনের আবেগ প্রকাশ হওয়ার উপক্রম হলেই সে তা দমন করে। তার এ বিচিত্র আচরণের কারণেই সবাই তাকে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অলৌকিক পুরুষ বলে মনে করে। সে নিজেও সুকৌশলে কথাবার্তা এবং আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের অলৌকিক ব্যক্তির ইঙ্গিত দিয়ে এসেছে বরাবর। ফলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আন্তরিক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না কখনোই। এএকি নিজের স্ত্রী সঙ্গে কথা বলার সময়ও তাকে গাম্ভীর্যের মুখোস এঁটে থাকতে হয়। তার এই তৈরি আবরণটি এতোই শক্ত যে তা ভেদ করা কারো পক্ষেই কখনো সম্ভব হয় নি।

তবু সে যে আসলেই দুর্বল এবং নিঃসঙ্গ, এ সত্যটি একেবারে গোপন থাকে না। তার আভাস ধরা পড়ে রহীমার কাছে। জমিলাকে শাসনে রাখার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কী ভাবে প্রাণধর্মে উচ্ছল ও দুর্বিনীতা তরুনী বধূটিকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখবে সেই চিন্তায় সে দিশেহারা বোধ করে এবং জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,

'–কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জানাই, তুমি কও?'

ঐ ঘটনাতেই রহীমা যেন বুঝতে পারে তার স্বামীর দুর্বলতা কোথায় এবং তখন ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্রটি হয়ে যায় তার কাছে করুণার পাত্র। এরপর যদিও সে জমিলার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে– কিন্তু তখন আর তার সেই প্রতিষ্ঠিত সংকল্পবদ্ধ নির্বিকার আচরণ নেই। জমিলা তার মুখে থুথু দিলে সে ক্ষেপে ওঠে। এ ক্ষিপ্ততা যতোখানি না তার পৌরুষের প্রতি অপমানের কারণে, তার চাইতে বেশি তার মনের ভেতরকার ভয়ের কারণে। সে জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজার ঘরে এনে ধপাস করে বসিয়ে দেয়। "তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দূরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরের আকাশ নীরব কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যতো অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বস থেকে বাঁচার তীব্র ব্যাকুলতা।"

মজিদ চরিত্রের এ দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়ায় একটি বিষয় আলোকিত হয়ে ওঠে যে মজিদ শেষ পর্যন্ত মানুষই, যদিও শেষ পর্যন্ত সে মানবতার পক্ষে আসতে পারে না, দয়ামায়া ও স্নেহমমতায় প্রাণধর্মের বিপক্ষেই থেকে যায়, তবু সে মানুষই। তবে কেমন মানুষ? না মানবতা বিরোধী মানুষ। যে পক্ষ মানুষের বিকাশের অন্তরায়, সেই পক্ষের মানুষ। রহীমার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়লেও রহীমা তার নির্দেশ অমান্য করলেও ভণ্ডামি ও কুসংস্কার দিয়ে বাঁধানো নিজের প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে সে শেষ পর্যন্ত অটুট রাখার চেষ্টা করে। ফলে মজিদ চরিত্র মানবিক হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো প্রকার উত্তরণ ঘটে না। উপন্যাসের প্রথমে যে মজিদের আবির্ভাব হয়েছিল, মধ্যবর্তী অবকাশে, নানাবিধ ঘটনা ঘটাবার পরও উপন্যাসের সমাপ্তিতে সে সেই মজিদই থেকে যায়। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বলা যায় 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্র মানবতাবিরোধী শক্তির যথার্থ প্রতিভূ। তার দয়া নেই, মায়া নেই, ভালবাসা নেই– এক কথায় কল্যাণকর ও মঙ্গলময় কোনো প্রাসঙ্গিকতাকেই তার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। সে কুসংস্কারের অকল্যাণ এবং শোষণের যুগযুগান্তর ব্যাপী চালু প্রক্রিয়াটির ধারক বাহক এবং রক্ষক – সে একাকী, মানবিক দায়বিহীন, নিঃসঙ্গ একটি অস্তিত্ব।

প্রশ্ন-৮ : লালসালু উপন্যাসে নায়িকা কে? তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান।

উত্তর : লালসালু উপন্যাসের নায়ক চরিত্র নিঃসন্দেহে মজিদ। কিন্তু নায়িকা চরিত্র কে? এ প্রশ্নের জবাব আমাদের বিবেচনা করে দিতে হয়। কারণ যেহেতু উপন্যাসের প্রায় সমগ্র বিস্তৃতি জুড়ে মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমার অবস্থান এবং মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তার একটি সহায়ক ভূমিকা আছে সেইহেতু তাকেই উপন্যাসের নায়িকা বলে আমাদের মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরতর বিবেচনায় দেখা যাবে জমিলার গুরুত্ব অনেক বেশি। যদিও তার আবির্ভাব উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বয়সে সে নিতান্তই কিশোরী, তবু সে-ই পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করে বেশি। মজিদের

জীবনবৃত্তে কোনো প্রতিপক্ষ আমরা লক্ষ্য করিনা। মজিদকে কেউ বিচলিত করতে পারে নি কখনো। কিন্তু আমরা দেখি এ কিশোরী বধূটিই মজিদকে ভীত, উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার এবং তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিত ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়। কাহিনী বিন্যাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবতারণার জন্যে এমন একটি চরিত্র অপরিহার্য ছিলো একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। সর্বোপরি বলা যায় জমিলা চরিত্রের আবির্ভাব না ঘটলে মজিদ চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটিই অনুদঘাটিত থেকে যেতো। এসব বিবেচনা করেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলাই, নায়িকা।

লেখক জমিলার পিতৃপরিচয় আমাদের জানাননি। এমনকি বিবাহ পূর্বকালে তার জীবন-যাপন পিতৃগৃহে কী রকম ছিলো লেখক আমাদের তাও জানান নি। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে সে দরিদ্র ঘরের সন্তান আর সে কারণেই তার দারিদ্র্য পীড়িত পিতা একজন প্রৌঢ় এবং বিবাহিত মানুষের সঙ্গে কিশোরী কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। সে যখন মজিদের সংসারে আসে তখন তাকে দেখে শান্ত দুর্বল বেড়াল ছানাটির মতো মনে হতো। মজিদ এমন একটি বউ ঘরে আনতে চেয়েছিলো যে খোদাকে ভয় করবে। জমিলাকে দেখে মনে হয়েছিলো খোদাকে শুধু নয়, সমস্ত কিছুকেই সে ভয় করবে। "যদি কেউ তাকে হেসে আদর করতে চায় তাহলেও সে ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।"

কিন্তু দেখা গেলো ধারণা ভুল। জমিলা উচ্ছল হাসি হাসে। কৌতুককর কথা বলে স্বামীর বয়স নিয়ে কটাক্ষ করে এবং স্বামীর রক্তচক্ষু শাসন মানতে চায় না। তার হাসি মাজারের শীতল স্তব্ধ ও শ্রদ্ধা-ভীতির জগতে একটি চিড় ধরিয়ে দেয়। তাকে শাসন করা হয়। কিন্তু তবু-তার হাসি থামে না। তাকে চৌকাঠে বসে থাকতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু সে নিষেধ উপেক্ষা করে। ক্রুদ্ধ অধৈর্য স্বামী বিকট স্বরে ধমক দিলে সে পরম হেলা ভরে ওঠে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়। স্পষ্টতঃই দেখা যায় জমিলা স্বামীকে উপেক্ষা করেছে। স্বামীর বিছানা পরিহার করে রহীমার বিছানায় গিয়ে শোয়। নামাজ না পড়েই একদিন সে ঘুমিয়ে পড়ে। জোর করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে নামাজ পড়ছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে সে কোনো জবাব দেয় না। নামাজ পড়েছে, এ কথাটি সে মুখ দিয়ে বের করে না। বোঝা যায় 'তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে।"

হাস্যমুখরা চপলা জমিলা যেমন, তেমনি এ নীরব বিদ্রোহী জমিলা স্বামী-মজিদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ যে তার আচরণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক প্রাণধর্মের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। খুশিতে কৌতুকে জমিলা উচ্ছল হাসি হাসে এ যেমন স্বাভাবিক প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশ, তেমনি শাসন পীড়ন হলে সে যে সেটা উপেক্ষা করে ও নীরব প্রতিবাদ জানায় এও সেই স্বাভাবিক প্রাণধর্মেরই সহজ প্রকাশ। আর এ খানেই মজিদের আতঙ্ক। ভীতি আন্ধিশ্বাস আর কুসংস্কার দিয়ে গড়ে তোলা মজিদের প্রতারণা আর শোষণের শীতল সাম্রাজ্যে যদি এ রকম প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশ ঘটতে থাকে, যদি এভাবে তার প্রতাপ আর প্রতিষ্ঠার প্রতি অবহেলা আর উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়, তাহলে তার নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বাইরের আক্রমণ সে প্রতিহত করতে পারে। কূটকৌশল প্রয়োগ করে সে প্রবল প্রতাপান্বিত পীরসাহেবকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছে, খালেক ব্যাপারীর মতো মাতব্বরের আনুগত্য এখন তার হাতের মুঠোয় শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী আধুনিক তরুণ আক্কাস আলীকে গ্রাম থেকে সহজেই সে বিতাড়িত করেছে– কিন্তু জমিলার বিরুদ্ধে কী করবে? সে ভেবে পায় না। জমিলা বুদ্ধি কিংবা কৌশল দিয়ে বাইরে থেকে তাকে আঘাত করে না, করে তার সহজ প্রাণধর্মের প্রকাশ দেখিয়ে তার নিজেরই অন্তঃপুরের ভেতর থেকে। এমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে কখনো সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে নি– এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৌশলও সে জানে না। মোট কথা জমিলা তার ক্ষুদ্র দেহ, অপিরণত মন এবং একাকী অস্তিত্ব নিয়ে তার স্বামীর প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তার শক্তি শুধু একটিই– সেটি হলো তার সহজ প্রাণধর্ম।

ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেটি বলা যায় প্রায় আবহমানকালের। এর শুরু মানব সভ্যতার সুচনাকাল থেকে। হৃদয় ধর্ম বড়, না প্রথামুলক ধর্ম বড়? মানুষের সহজ সৃজনশীল প্রাণময় জীবন বড়, না প্রথাবদ্ধ অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের ভারে ন্যুব্জ ও বন্ধ্যা জীবন বড়? এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় পাঠককে। আর তাতে জমিলা সহজ প্রাণধর্মের উচ্ছল উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। তবে মাজারের স্তূপটি ভেঙ্গে, সকল ভণ্ডামি, শোষণ এবং অন্ধবিশ্বাস তুচ্ছ করে জমিলা কিংবা প্রকাশ্যেও সহজ ও সৃজনশীল প্রাণধর্মের মাহাত্মপ্রচার করেনি। বরঞ্চ দেখি, প্রতিপক্ষেরও অত্যাচারে সংজ্ঞাহীন জমিলা সংজ্ঞাহীনই থেকে গেছে। তবে তার অর্থ এ নয় যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে, জমিলা

আত্মসমর্পণ করেছে। বরং দেখি, জমিলার বিদ্রোহ রহীমার মনেও সহজ প্রাণধর্মের প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছে। ফলে জমিলা হয়ে উঠেছে অন্যায়, শোষণ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের প্রতিপক্ষের বিদ্রোহের প্রতীক। এ রকম একটি বিদ্রোহী বালিকাবধূকে সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে পাওয়া ভার। সেদিক থেকে জমিলা এক অনন্য চরিত্র।

প্রশ্ন-৯ : 'লালসালু' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখুন।

উত্তর : উপন্যাসে ভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়বস্তু, চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ ও আবহ উপন্যাসের ভাষা তৈরি করে। এ জন্য উপন্যাসের ভাষার ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে খুব সচেতন হতে হয়। উপন্যাস বাস্তব জীবনের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ, সে কারণে উপন্যাসের ভাষারীতি ও সংলাপেও জীবন-ঘনিষ্ঠতা থাকে। জীবনকে বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়। একটি জনপদের শিক্ষিত শ্রেণী সাধারণত শিষ্ট ভাষায় কথা বলে। এদের অধিকাংশই শহরাঞ্চলে থাকে। এদের জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে শিষ্ট ভাষার সংলাপই ব্যবহার সম্মত। কিন্তু গাঁয়ের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মুখে শিষ্ট ভাষার প্রয়োগ হলে তা বেমানান ঠেকবে। এটি তখন অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হবে। এবং এটিও ধারণা হবে যে, এ ভাষা জীবনের কাছে যায়নি। একটি দেশের অঞ্চল বিশেষের জীবনাবহে ভাষার বিশেষ আদল আছে। ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি এবং ভাষা অবিচ্ছিন্ন। এখন এ অঞ্চলের মানুষেরা যদি উপন্যাসে আসে, তাহলে তাদের ভাষাও উপন্যাসে স্থান পাবে। উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কিন্তু সহজ কাজ নয়। দক্ষ উপন্যাস শিল্পীই পারেন আঞ্চলিক ভাষার সুন্দর রূপ দিতে। বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্ট পরিচর্যা হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন নিপুণ শিল্পী। 'লালসালু' উপন্যাসই এর প্রমাণ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। 'লালসালু' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে মুসলিম-অধ্যুষিত পূর্ববাংলার তথা বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এ চিত্র সুপরিচিত। কবরের উপর লালসালু বিছিয়ে পীরের মাজারে রূপ দেয়া অভিনব কিন্তু নয়। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ধর্মের অতশত তারা বোঝে না, কিন্তু ধর্মীয় পুরুষ ও মোল্লামৌলবী শ্রেণীর মানুষদের তারা বেজায় ভক্তি করে। আর এদের ভক্তি, বিশ্বাস, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীর দল মেতে ওঠে। 'লালসালুতে আমরা এ চিত্রই পাই। এ চিত্রের উন্মোচনে আঞ্চলিক ভাষা খুব সহায়ক হয়েছে। লালসালু উপন্যাসের পুরো পটভূমিই গ্রাম। তাও আজ কালকার গ্রাম নয় বহু বছর আগের অজপাড়াগাঁ। নাগরিক জীবন থেকে দূরে বহুদূরে, বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগবিহীন, দুর্গম। এ গ্রামে ভালো সড়ক নেই, বিজলি বাতি নেই, ইস্কুল নেই, অর্থাৎ কোন আধুনিক জীবন ব্যবস্থা নেই। এ গ্রাম নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামের মানুষগুলোর প্রধান কাজ ফসল উৎপাদন। এ রকম একটি গ্রামের একটি ভাঙা কবরকে পীরের মাজারে রূপান্তরিত করে মজিদ নামক জনৈক ধর্ম ব্যবসায়ীর জীবন প্রতিষ্ঠার কাহিনী লালসালু উপন্যাসের মূল বিষয়। এ উপন্যাসে নাগরিক মানুষ নেই, সকল পাত্রপাত্রীই গ্রামের। সঙ্গত কারণে তারা আঞ্চলিক ভাষাতে কথা বলেছে। মজিদ বলেছে, রহীমা বলেছে, জমিলা বলেছে, খালেক ব্যাপারী, হাসুনির মা, ধলা মিঞা সবাই নিজেদের ভাষায় কথা বলেছে। উপন্যাসের বর্ণনাত্মক অংশগুলোতে আছে শিষ্ট চলতি বাংলা, আর সংলাপে আছে আঞ্চলিক ভাষা। তবে একটি সংশয় থেকে যায়, 'লালসালু' ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা বাংলা দেশের কোন অঞ্চলের ভাষা। উপন্যাসটির প্রথম দিকে যে বর্ণনা পাই, তাতে মনে হয় নোয়াখালি অঞ্চলের চিত্র এটি। পরে উপন্যাসটির পটভূমি সরে আসে ওখান থেকে, স্থিত হয় গারো পাহাড়ের কাছাকাছি কোন গন্ডগ্রামে, সম্ভবত এটি ময়মনসিংহের কোন একটি গ্রাম হবে। সে যাই হোক, এ উপন্যাসে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা নোয়াখালির নয়, ময়মনসিংহেরও নয়। তাহলে কোন অঞ্চলের উপভাষা এটি? সে প্রশ্নের উত্তরও নিরঙ্কুশ নয়। তবে এটি অনুমান করা যায় যে, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে 'লালসালু'র আঞ্চলিক ভাষার মিল রয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আশ্চর্য সংযম ও কুশলতায় এ ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে মজিদের সংলাপের ভাষায় তিনি দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েচেন। মজিদ আর সকলের মতো গ্রামের ভাষাতে কথা বলেছে। তবে তার কথাবার্তার ও সংলাপের বিশিষ্ট পরিচয় আছে। মজিদ মোল্লা-মৌলবী শ্রেণীর লোক এবং মাজারের খাদেম। গ্রামের মানুষের উপর তার অসাধারণ প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব বজায় রাখতে তার মুখের বুলিকেও সে কাজে লাগিয়েছে। লোকে বিশ্বাস করে, মজিদ কোরান হাদিস পড়া রুহানি তাকতের লোক। আঞ্চলিক বুলির মধ্যে

যথেষ্ট আরবি ফার্সি শব্দ মিশিয়ে কথা বলার বিশেষ ঢঙ মজিদ রপ্ত করেছে। এ বুলির তার বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে মানিয়েছেও চমৎকারভাবে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মজিদের সংলাপকে খুব সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করেছেন এবং সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মজিদের বুলি হয়তো বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা নয়, এটা বাংলাদেশের মোল্লা শ্রেণীর মানুষের সাধারণ বুলি। কিন্তু আঞ্চরিক পরিবেশের সঙ্গে এ ভাষা মানিয়ে যায় চমৎকার ভাবে। তখন মজিদের ভাষা আর রহীমার ভাষার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় না; কিংবা হাসুনির মা আর খালেক ব্যাপারীর ভাষাকে একরকম মনে হয়। অর্থাৎ এসব পাত্রপাত্রীর ভাষা একই বৃত্তের ভাষা, একই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে শৈল্পিক নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন-১০ : উপন্যাসের 'লালসালু' নামকরণের প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

উত্তর : উপন্যাসের নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য থাকে। সাধারণত বিষয়বস্তু, আখ্যান, ভাবের গূঢ়ার্থ, চরিত্রের উপন্যাসের নামকরণে ভূমিকা রাখে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসে নামকরণে আখ্যান ও চরিত্রের চেয়ে বিষয়বস্তু ও ভাবচিন্তার ব্যঞ্জনাই বেশি।

লালসালু হল লাল রঙের বলাত। এমনিতে লাল কাপড়ের বিশেষ কোন মহিমা নেই। কিন্তু লাল রঙ খুব উজ্জ্বল এবং এ রঙটি চোখে পড়ে বেশি। সুতরাং এ রঙটিকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী যুগ যুগ ধরে এ রঙটিকে খুব সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগিয়েছে। কবরের উপর লাল কাপড় বিছিয়ে দিলে কবরের গুরুত্ব হঠাৎ বেড়ে যায়। তখন তা আর সাধারণ কবরে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা তখন মাজারে পরিণত হয়। এ কবরের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়ে সহসা। কবরটি তখন মানুষের ভক্তিপ্রীতির আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে। তখন মানুষ প্রতিনিয়ত কবরে যায়; জেয়ারত করে, দোয়া দরুদ পড়ে এবং শিরনি দেয়। টাকা পয়সা ও দিতে থাকে। এভাবে মাজারটি পরলোক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। এ মাজার বাংলাদেশের লোক জীবনে অসামান্য প্রভাব ফেলে। সুতরাং লালসালুর তাৎপর্য বুঝতে হবে।

একসময় বাংলাদেশে পীর ফকিরদের আধিপত্য ছিল। এখন তেমন আধিপত্য না থাকলেও পীরভক্তি উবে গেছে তা বলা যাবে না। খানকা, দরগা, মাজার বাংলাদেশের সব জায়গাতেই আছে। লালসালুর ব্যবসায় গ্রামে শহরে সর্বত্রই চলে। বাংলাদেশের বিশাল লোকজীবনে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বেশি। পীর ফকিরদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের জন্য অশিক্ষার আর কুসংস্কারই দায়ী। মানুষ মনে করে পীর ফকিরেরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, আল্লাহর নৈকট্যে তারা আছে, সুতরাং তাদের মুরিদ হয়ে তাদের সেবাযত্ন করতে পারলে পাপতাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ কারণে ফকির দরবেশ বা মোল্লা মৌলবী শ্রেণীর লোকের প্রতি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের দুর্বলতা। এ দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে মোল্লা মৌলবী শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। তাদের বিশেষ কর্ম তৎপরতার মধ্যে রয়েছে কবরকে কারুকার্যমণ্ডিত ঝালরওয়ালা লাল বলাতে আবৃত করে মাজারে পরিণত করা এবং তার মাধ্যমে দুনিয়াদারি হাসিল করা। এ ব্যবসায় বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র পরিলক্ষিত।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে লালসালু ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতীক। বাংলাদেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত, বিজ্ঞান বুদ্ধিহীন মানুষের জীবনে লালসালুর প্রভাব খুবই গভীর। এ ব্যাপারটিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। মনে রাখতে হবে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাস লিখেছেন। লালসালুর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিবৃতিদান করতে যাননি তিনি। লালসালুকে কেন্দ্র করে যে জীবন গড়ে উঠেছে তা তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মের বিষয় হয়েছে। এ জীবনের রূপ সৌন্দর্য ও প্রকৃতি এবং সামাজিক তাৎপর্য উপাখ্যানে রূপায়িত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এ দিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যে একজন সফল শিল্পী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার ও ধর্মীয় রীতিনীতির আলোকে মানবজীবনকে অবলোকন করতে চেয়েছেন। লালসালুর প্রতীক এ ক্ষেত্রে তাঁকে চমৎকারভাবে সাহায্য করেছেন।

লালসালু উপন্যাসে আমরা পাই মজিদ নামক এক ভাগ্যান্বেষী মোল্লার জীবনচিত্র। মজিদ অনেক ঘাটের পানি খেয়ে অবশেষে মহব্বতনগরে এসে আস্তানা গেড়েছে। একটি টাল খাওয়া কবরকে জনৈক মোদাচ্ছের পীরের মাজারে রূপদান করা মজিদের কীর্তি। অজ্ঞ অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষীদের প্রতারিত করতে মজিদের মোটেও বাধেনি। মজিদ সালু কাপড়ে ঢাকা মাছের পিঠের মতো উঁচু কবরটি তার সকল শক্তির মূল। সুতরাং এঁকে আঁকড়ে থেকে সে নিজের জীবন রচনা করে। সে সংসারী হয়, জমিজমা ও অর্থবিত্তের মালিক হয়। সবচাইতে বড় কথা, সে গ্রামের শক্তিধর পুরুষ হয়ে

ওঠে, তার অঙ্গুলি হেলনেই সমাজ চলে। তাকে ছাড়া সমাজ অচল। খালেক ব্যাপারীর মতো গ্রাম্য মাতব্বরেরাও তার সম্পূর্ণ বশ। কেউ যদি তাকে অমান্য করতে চায় কিংবা তার অবাধ্য হয় অথবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে তখন তাকে শক্তহাতে শাস্তি দিতে কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মজিদ মোটেও বিলম্ব করে না। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কিংবা অবাধ্যতাকারীদের সে জব্দ করেছে; উদাহরণ আওয়ালপুরের বৃদ্ধ পীর সাহেব, আক্কাস, আমেনা বিবি এবং সর্বোপরি তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জমিলা। সবাইকে অতিক্রম করে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সে সক্ষম হয়েছে। জীবনের ক্ষেত্রে মজিদের এত বড় প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে সেই লালসালুতে আবৃত মাজার। সুতরাং উপন্যাসের লালসালু নাম অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এ নামটি যথাযথ এবং অসামান্য তাৎপর্যমণ্ডিত, সামাজিক দিক থেকেও মজিদের দিক থেকেও।

প্রশ্ন-১১ : লালসালু উপন্যাসের বাক্য প্রকরণ শব্দ প্রয়োগ কৌশল ও উপমা ব্যবহারের সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটি আলোচনা লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে 'লালসালু' নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবীদার। এ উপন্যাসের বিষয় গৌরব অনস্বীকার্য। বিষয়কে উপযুক্ত ভাষায় অর্থাৎ সুন্দর বাক্যে, শব্দে ও রূপকল্পে ফুটিয়ে তুলতে পারলে উপন্যাস-শিল্পী খ্যাতিমান হন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বেশি উপন্যাস লেখেন নি, তাঁর মাত্র তিনটি উপন্যাস এবং 'লালসালু' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাস ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু ক্ষুদ্র হলে কি হবে, বিষয়ে ও ভাষায় এ উপন্যাস একটি স্মরণীয় রচনা। বিশেষ করে ভাষারীতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কথা কম, কিন্তু কথাগুলো গভীর অর্থবহ। বাক্য গঠনে ওয়ালীউল্লাহ দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাক্যে বাহুল্য নেই, মনে হয় সব বাক্যই সুনির্বাচিত। অর্থাৎ বাক্যের গাঁথুনি ও ভাষার সৌন্দর্যের কথা বিবেচনা করি, তাহলে বলতে হবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন নিপুণ কথাশিল্পী। উপন্যাসের বর্ণনাত্মক অংশে ওয়ালীউল্লাহ শিষ্ট মান বাংলা ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে ভাষা আধুনিক ও সংকেতময় হয়ে উঠেছে। এ কথার প্রমাণ হিসেবে 'লালসালু' উপন্যাস থেকে প্রচুর উদাহরণ দেয়া যায়। আপাতত দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝানো যেতে পারে। উপন্যাসের শুরুতে ভাগ্যান্বেষী মানুষদের বেরিয়ে পড়বার একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। মানুষগুলি রেল গাড়িতে চলাফেরা করে। সে রেলগাড়ি হয়তো রাতের বেলা কোন এক স্টেশনে পৌঁছায়। তখন চারদিকে কোলাহল পড়ে যায়। এ ঘটনাটিকে বর্ণনা করছেন লেখক, এভাবে- 'রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে।' এ বাক্য ঠিক সহজ বাক্য নয়। ঘটনা ও চিত্রকে আধুনিক প্রতীকী ভাষায় তুলে ধরেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তাঁর বর্ণনা পর্যবেক্ষকের মতো, খুব স্পষ্ট ও যথাযথ। মুসল্লিরা নামায পড়ার আগে ওজু করে নেয়। পুকুরধারে সান বাঁধানো ঘাট নেই, আছে হয়তো এক টুকরো প্রস্তরখণ্ড। ওজু বানানোর দৃশ্যটি ওয়ালীউল্লাহর বর্ণনায় এভাবে এসেছে- 'মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার উপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে।' কখনো কখনো সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেন যে তাঁর ভাষার শক্তিমত্তাই শুধু প্রকাশ পায়। যেমন, 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' আশ্চর্য সুন্দর সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগম্ভীর বাক্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ রকম করে সৃষ্টি করেন। ওয়ালীউল্লাহ শব্দ প্রয়োগ কৌশলও এভাবে সার্থক হয়। 'লালসালু'র ভাষায় তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক ও দেশজ শব্দের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। বর্ণনায় ও মুখের সংলাপে যথাযথ ভাবে শব্দগুলো বসেছে। মজিদ পীর মোল্লা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তার মুখের বুলির বিশিষ্টতা আছে। আঞ্চলিক বাকরীতির মধ্যে আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ তার কথাতে থাকবে। মজিদের সংলাপের তিনটি নমুনা এখানে দেয়া হল ঃ

১. আপনারা জাহেল, বে এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?
২. খোদার কালামের সাহায্যে যে কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।
৩. নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কুল রাখো।

উপমা

লালসালুর ভাষারীতির বিশিষ্ট পরিচয় উপমার মধ্যেও পাওয়া যায়। উপমা হলো দুই বস্তুর তুলনা। এ তুলনা দেয়া হয় একটা ভাব বা চিত্রকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। উপমার সাহায্যে অনেক বিষয় স্বচ্ছ বা স্পষ্ট করাও যায়। সে জন্য শিল্পীর ভাষারীতিতে উপমা ব্যবহারের গুরুত্বও থাকে। লালসালু উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সুন্দর সুন্দর উপমার প্রয়োগ করেছেন। মাজারকে তিনি উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর।' মাছের পিঠের মতো কবর' এ উপমা অনেক বার ব্যবহার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। কিছু গভীর ভাবাত্মক উপমাও ব্যবহার করেছেন তিনি, আবার সহজ সরল উপমাও। যেমন-

'গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে, রহীমার সারা দেহে'– কিংবা

'নিস্পন্দ ধান ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল।'

মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা নিয়ে উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এ রকম করে-

'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।'

এসবই আধুনিক প্রকাশভঙ্গি, আধুনিক উপমা। এ জাতীয় উপমা ব্যবহারের লালসালুর ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

আরও যা পড়তে পারেন

'লালসালু' ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আরও দুটি উপন্যাস লিখেছেন। এগুলোর নাম হচ্ছে– চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো। সম্ভব হলে এগুলো পড়বেন। এছাড়া সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত ছোটগল্প, নয়ন চারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, নাটক বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি পড়তে পারেন। এগুলো পাবেন সৈয়দ আকরাম হোসেন সম্পাদিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী' ১ ও ২ গ্রন্থে। বইগুলো প্রকাশ করেছে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করলে সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখা 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দ ব্যবহার–

এগুলো সম্পর্কে আরও জানতে হলে– ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান গ্রন্থটি পড়ুন।